গণমাধ্যমের চরিত্র
নোয়াম চমস্কি
BANGLAYAN

গণমাধ্যমের চরিত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গণমাধ্যমের চরিত্র

নোয়াম চমস্কি

Centre for Advanced Media
(CAM)
Book No.....64

বাঙলায়ন

www.pathagar.com

ISBN 984 70085 0015 3

প্রকাশক : বাঙলায়ন। ৬৯ প্যারিদাস রোড বাঙলাবাজার ঢাকা থেকে
অস্ট্রিক আর্যু কর্তৃক প্রকাশিত ও শফিক মনজু কর্তৃক মুদ্রিত
প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১৪ ফ্রেব্রুয়ারি ২০০৮
মুদ্রণ তত্ত্বাবধান : টোটেম একাডেমী

গণমাধ্যমের চরিত্র। নোয়াম চমস্কি। গণমাধ্যম বিষয়ক দুটি রচনার সংকলন
মন ফকিরা, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড কলকাতা-এর সৌজন্য প্রকাশিত

A Collection of Two Articles on Mass Media by Noam Chomsky
Published by Austrik Aarzu & Printed by Shafik Monzu
on behalf of Banglayan
Traslated by Goutam Gangapadyaya
Correspondence : mail : 69 Pyaridas road banglabazar
dhaka-1100. Bangladesh.
email : banglayan@gmail.com
cell. 01199114737, 01815001752

মূল্য : ৬০ টাকা

www.pathagar.com

রচনাক্রম

মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ। ৭-৪৫
মঙ্গলগ্রহের সাংবাদিক। ৪১-৬৩
www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ

প্রচারের চমকপ্রদ সাফল্য

সমকালীন রাজনীতিতে গণমাধ্যম বা প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা এই প্রশ্ন করতে আমাদের বাধ্য করে যে ঠিক কী জাতীয় বিশ্বে ও কোন্ ধরনের সমাজে আমরা বাস করতে চাই? বিশেষ করে, গণতন্ত্রের ঠিক কোন্ অর্থে আমরা চাই যে এ সমাজ গণতান্ত্রিক হয়ে উঠুক। গণতন্ত্রের দুটি ভিন্ন ধারণা পরস্পরের বিপরীতে স্থাপন করে আমি এই আলোচনা শুরু করতে চাই।

গণতন্ত্রের একটি ধারণায় দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক সমাজ মানে এমন এক সমাজ, যেখানে নিজেদের যাবতীয় বিষয়-আশয়ের ব্যবস্থাপনায় অর্থপূর্ণ ভাবে অংশ নেওয়ার উপায় সাধারণ মানুষের আছে। পাশাপাশি সেখানে সংবাদ কিংবা তথ্যের মাধ্যম খোলামেলা ও স্বাধীন। অভিধান দেখলে গণতন্ত্র শব্দটার এ জাতীয় একটা সংজ্ঞাই পাবেন।

গণতন্ত্রের বিকল্প এক ধারণায় দেখছি যে, নিজেদের নানাবিধ বিষয়-আশয়ের ব্যবস্থাপনা থেকে সাধারণ মানুষকে অবশ্যই সরিয়ে রাখতে হবে এবং সংবাদ-মাধ্যমকে অবশ্যই কঠোর ও সংকীর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের এ ধারণা শুনে একটু অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু এটাই যে প্রচলিত ধারণা, এ কথাটা এখানে বোঝা দরকার। বাস্তবে বহু দিন ধরে এ ধারণা শুধু প্রয়োগে নয়, রয়েছে তত্ত্বেও। এর দীর্ঘ ইতিহাস শুরু হয়েছে সেই সতেরো শতকে ইংল্যান্ডে প্রথম আধুনিক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় থেকে, যেখানে এই দৃষ্টিকোণই বহুলাংশে প্রকাশিত। আমি আপাতত আধুনিক যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব এবং বলব, কী ভাবে গণতন্ত্রের এই ধারণা গড়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে এ কথাও বলব যে কেন এবং কী ভাবে গণমাধ্যম ও তথ্যহীনতার সমস্যা এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

প্রচারের আদি ইতিহাস

প্রথম আধুনিক সরকারি প্রচারকর্ম দিয়েই আপাতত শুরু করা যাক। উড্রো উইলসন-এর প্রশাসন তখন। ১৯১৬ সালে উড্রো উইলসন 'বিজয় ব্যতিরেকেই শান্তি'র মঞ্চে রাষ্ট্রপতি হিশেবে নির্বাচিত হন।

সময়টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক মাঝামাঝি। সাধারণ মানুষ তখনও খুব শান্তিবাদী, কার্যত ইয়োরোপীয় এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোন কারণ তখনও পর্যন্ত তারা খুঁজে পায়নি। এ দিকে উইলসনের প্রশাসন তো যুদ্ধের প্রতি ভীষণ ভাবে দায়বদ্ধ, ফলে এ ব্যাপারে কিছু একটা তাদের করতেই হয়। ক্রিল কমিশন নামে এক সরকারি প্রোপাগান্ডা কমিশন তখন তারা গঠন করে, এবং মাত্র ছ-মাসের মধ্যে শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষকে তা এক ক্ষিপ্ত, যুদ্ধোন্মাদ জনতায় পরিণত করতে সফল হয়— যে-জনতা জার্মানির যা-কিছু, সব ধ্বংস করতে চায়, জার্মানদের ধরে ছিঁড়ে ফেলতে চায়, ঐ যুদ্ধে যোগ দিয়ে দুনিয়াকে রক্ষা করতে চায়। এক এক বিরাট সাফল্য, ক্রমে যা আরও বড় সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঠিক এই সময়ে এবং যুদ্ধের পরেও প্রায় একই কায়দায় তথাকথিত এক লাল আতঙ্কের উন্মাদনা খুঁচিয়ে তোলা হয়— ইউনিয়নগুলোকে ধ্বংস করা এবং সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক চিন্তার স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার ক্ষেত্রে তা দারুণ সফলও হয়। গণমাধ্যম

www.pathagar.com

এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দিকে থেকে এর পক্ষে খুব জোরালো সমর্থন মেলে। বস্তুত এর ব্যবস্থাও করেছিল তারা, এবং তারাই তা ঠেলেঠুলে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর তাতে সাফল্যও মেলে সাংঘাতিক।

উইলসন-এর যুদ্ধে সোৎসাহে ও সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছিল যারা, তারা ছিল সব প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী লোকজন, জন ডিউই চক্রের ঘনিষ্ঠ। সে সময়ে তাদের নিজেদের লেখা পড়লে দেখবেন যে, 'সমাজের অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান লোক' হিশেবে অনিচ্ছুক জনতাকে আতঙ্কিত করে যুদ্ধবাজ উন্মত্ত জনতায় পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে তারা ভীষণ গর্বিত। এ জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি গুলোর চরিত্র ছিল ব্যাপক হুনদের নৃশংসতা নিয়ে যেমন বহু গল্প বানানো হয়েছিল, বেলজিয়ান শিশুদের হাত-পা ছিঁড়ে ফেলা থেকে আরও যত জঘন্য ঘটনার কথা ইতিহাসের বইতে এখনও পাওয়া যায়— এ-ও প্রায় তেমনই। এর বেশির ভাগটাই ছিল ব্রিটিশ প্রচার মন্ত্রকের উদ্ভাবন। সে সময়ে 'প্রায় গোটা বিশ্বের চিন্তাধারাকে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালনা করা'র দায় ছিল তাদের, গোপন দলিলে এ কথা তারা নিজেরাই লিখে গেছে। কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর অর্থে তারা চেয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর বুদ্ধিমান সদস্যদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে, যাতে তারা এই সর্বৈব মিথ্যা প্রচারকে ছাড়িয়ে দিয়ে শান্তিবাদী এক দেশকে যুদ্ধকালীন উন্মত্ততায় নিয়ে যেতে পারে। পদ্ধতিটা কাজে দিয়েছিল, দারুণ কাজে দিয়েছিল। এবং এর থেকে একটা শিক্ষাও পাওয়া গিয়েছিল : শিক্ষিত লোকেরা যখন সরকারি প্রচারকে সমর্থন করে এবং এর থেকে যখন কোন রকম বিচ্যুতি অনুমোদন করা হয় না, তখন তার প্রভাব হয় সাংঘাতিক। হিটলার এবং আরও অনেকে এর থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন, আর আজও তা অনেকে অনুসরণ করছেন।

দর্শকের গণতন্ত্র

আর-একটা গোষ্ঠী যারা এই সাফল্যে অভিভূত হলেন, তারা হচ্ছেন উদারনৈতিক গণতন্ত্রের যত তাত্ত্বিক আর সংবাদ-মাধ্যমের অগ্রণী সব ব্যক্তিত্ব।

www.pathagar.com

যেমন ধরুন, ওয়ালটার লিপমান। তিনি ছিলেন মার্কিন সাংবাদিকদের মহাচার্য, ঘরোয়া ও বৈদেশিক নীতির মস্ত সমালোচক এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিরাট তাত্ত্বিক। তাঁর প্রবন্ধ সংকলনটা যদি নেড়েচেড়ে দেখেন তো দেখবেন যে, 'উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ভাবনার প্রগতিশীল তত্ত্ব' গোছের সব উপ-শিরোনামে সেটা ভর্তি। লিপমান এই প্রোপাগান্ডা কমিশনগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কোথায় তাদের সাফল্য, তা বুঝতেন। 'গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে বিপ্লব' বলে যাকে তিনি অভিহিত করেছিলেন, 'সম্মতি আদায়ে'র কাজে তা তিনি ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। সম্মতি আদায় মানে প্রচারের এই নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে সাধারণ লোকে নিজেরা যা চায় না, সে ব্যাপারেও তাদের এক জায়গায় আনা। পদ্ধতিটাকে তিনি শুধু ভালো কেন, রীতিমতো দরকারি বলে মনে করতেন। দরকারি, কারণ তিনি বলেছেন, 'সাধারণ স্বার্থের বিষয়টা সব সময়ে জনমতে ঠিক প্রতিফলিত হয় না', 'কোন কিছু বোঝার মতো যথেষ্ট চটপটে আর 'দায়িত্বশীল লোকেদের' 'বিশেষ একটা শ্রেণী'ই শুধু তা বুঝতে আর সে বাবদে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে। এই তত্ত্বানুযায়ী উচ্চকোটির ছোট্ট একটা গোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবী কিছু লোক, যাদের কথা ঐ ডিউই-বাদীরাও বলেছেন, একমাত্র তারাই নাকি আমাদের সকলের সাধারণ স্বার্থের বিষয়গুলো বুঝতে সক্ষম, এবং তা নাকি সাধারণ লোকের বোধগম্যতার বাইরে। এখন, এই যে দৃষ্টিকোণ, এ অন্তত একশো বছরের পুরনো। একেবারে মার্কা-মারা লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গিও একই রকম। শক্তি হিশেবে জনপ্রিয় বিপ্লবকে ব্যবহার করে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের এক অগ্রণী অংশ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে এবং জনতাকে, যে-স্বপ্ন দেখার পক্ষে তারা নির্বোধ ও অযোগ্য, সে রকম এক ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। এই যে-লেনিনীয় ধারণা, তার সঙ্গে এর নিবিড় সাদৃশ্য আছে। আদর্শগত সাধারণ ধারণার দিক থেকে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। পরিবর্তনের বিশেষ কোন বোধ ছাড়াই লোকে যে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অবস্থান পালটানোটা এত সহজ করে নিয়েছে, আমার ধারণা, এ হল তার একটা কারণ। ক্ষমতা কোথায়— শুধু এটুকু বুঝলেই হল। হয়তো একটা জনপ্রিয় বিপ্লব হল আর আমরা রাষ্ট্রক্ষমতার ভাগ পেলাম, অথবা তা হল না—

www.pathagar.com

উভয় ক্ষেত্রেই আমরা শুধু তাদের জন্যই কাজ করব, আসল ক্ষমতা যাদের হাতে আছে, অর্থাৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠী। এবং ঐ একই কাজ আমরা বরাবর করব, নির্বোধ জনতাকে এমন এক দুনিয়ার দিকে ঠেলে নিয়ে যাব, বোকাদের নিজেদের পক্ষে যা বোঝাই সম্ভব নয়।

লিপমান প্রগতিশীল গণতন্ত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সমেত একে সমর্থন যুগিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হল, যথাযথ ভাবে ক্রিয়াশীল কোন গণতন্ত্রে নাগরিকদের বহু শ্রেণী থাকে। প্রথমেই থাকে সেই শ্রেণীর নাগরিকেরা, সমাজের সাধারণ সব বিষয়ের পরিচালনায় যাদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয়। এরাই হল বিশেষজ্ঞ। এরাই সেই লোক, যারা বিশ্লেষণ করে, সিদ্ধান্ত নেয়, তা কাজে পরিণত করে এবং বিশেষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত ব্যবস্থার মধ্যে থেকে সব কিছু চালায়। জনসংখ্যার এ খুব সামান্য অংশ। স্বাভাবিক ভাবেই এ ভাবনা যারাই বাস্তবে প্রায়োগ করুক না কেন, তারা স সময়েই ছোট্ট ঐ গোষ্ঠীর একজন হতে বাধ্য। বাদবাকি অন্যদের ব্যাপারে কী করা যায়, তা-ই নিয়ে তারা আলোচনা করে। বাদবাকি যারা এই ছোট্ট গোষ্ঠীর বাইরে থাকে, অর্থাৎ জনসংখ্যার বৃহদংশ, তারা হল লিপমান-এর ভাষায় 'হতবুদ্ধি পশুর দল'। 'হতবুদ্ধি এই পশুদলের গর্জন আর পদদলন' থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে আমাদের। এখন, গণতন্ত্রে দুটো 'নির্দিষ্ট কাজ' আছে। বিশেষজ্ঞরা, দায়িত্বশীল লোকেরা সেখানে প্রশাসনিক কাজ করে, অর্থ্যাৎ তারা সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারগুলো দেখে, তা নিয়ে ভাবে এবং পরিকল্পনা করে। আর ঐ হতবুদ্ধি পশুর দল, তারা কী করে ? গণতন্ত্রে তাদেরও নির্দিষ্ট কাজ আছে বৈকী। গণতন্ত্রে তাদের কাজ হল, তিনি বলেছেন, 'দর্শক' হওয়া—অংশ নেওয়া নয়। কিন্তু সে ছাড়াও তাদের আরও কিছু কাজ আছে, কারণ এর নাম গণতন্ত্র। মাঝে মাঝে তাদের ঐ সব বিশেষজ্ঞের মধ্যেই বিশেষ কারও পক্ষ নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। অন্য ভাবে বলা যায়, তাদের এ কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয় যে, 'আমরা তোমাকে আমাদের নেতা হিশেবে চাই' বা 'আমরা *তোমাকেই* আমাদের নেতা হিশেবে চাই।' কারণ এ হল গণতন্ত্র, মোটেই কোন একচ্ছত্রবাদী রাষ্ট্র নয়। এই পক্ষ নেওয়ার ব্যাপারটাকে বরে নির্বাচন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একবার কারও পক্ষ

www.pathagar.com

নেওয়ার পর ধরেই নেওয়া হয় যে তারা ফের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। ফের দর্শকে পরিণত হবে, মোটেই অংশগ্রহণকারী নয়। তো, এই হল যথাযথ ভাবে ক্রিয়াশীল গণতন্ত্রের স্বরূপ।

এর পেছনে একটা যুক্তি আছে। এমনকী বলা যায়, এর পেছনে এক ধরনের আবশ্যিক মৌলিক নীতিসূত্র আছে। সেটা হল এই যে, কোন কিছু বোঝার পক্ষে জনতা সত্যিই বড় নির্বোধ। নিজেদের বিষয়-আশয় বুঝে নিতে তারা যদি এর মধ্যে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করে তো তারা ফালতু ঝামেলা পাকাবে। ফলে তাদের এ কাজের অনুমতি দেওয়াটা হবে ভুল এবং অনৈতিক। এই হতবুদ্ধি পশুর পালকে আমাদের বশে আনতে হবে, ক্রুদ্ধ হয়ে প্রচলিত ব্যবস্থাকে পদদলিত করার ও ধ্বংস করার অনুমতি তাদের দেওয়া যাবে না। এ হল অনেকটা সেই রকম যুক্তি, যাতে বলা হয় যে তিন বছরের শিশুকে দৌড়ে রাস্তা পেরোতে দেওয়া ঠিক কাজ নয়। তিন বছরের শিশুকে এই স্বাধীনতা কেউ দেয় না, কারণ তা কী ভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা সে জানে না। তেমনই এই হতবুদ্ধি পশুর পালকেও কোন কাজে অংশ নিতে দেওয়া যায় না। তারা ঝামেলা পাকায়।

তো, এই পশুর পালকে বশে আনতে কিছু একটা দরকার। আর ঐ কিছু একটাই হল, গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে এই নতুন বিপ্লব : সম্মতি তৈরি করে নাও, আদায় করে নাও। গণমাধ্যম, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও জন-সংস্কৃতিকে এ জন্য বিভক্ত করতে হবে। রাজনৈতিক শ্রেণী ও সিদ্ধান্তকারীদের এ জন্য বাস্তবতার কিছু সহনীয় বোধ দিতে হয়, যদিও তার সঙ্গে যথাযথ কিছু বিশ্বাসও সঞ্চার করা দরকার। মনে রাখবেন যে এখানে কিন্তু অব্যক্ত একটা ভিত্তি আছে। দায়িত্বশীল লোকেদেরও নিজেদের কাছ থেকে যা লুকিয়ে রাখতে হয়, অব্যক্ত সেই ভিত্তিটা কিন্তু এই প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত যে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই অধিকারের জায়গাতে তারা পৌঁছলেন কী ভাবে। *আসল* ক্ষমতা যাদের হাতে, তাদের সেবা করেই তারা তা পেয়েছেন নিশ্চয়ই। আসল ক্ষমতার অধিকারীরাই সমাজের মালিক—সে একটা ছোট্ট গোষ্ঠী। বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর লোকেরা যদি তাদের কাছে এসে প্রস্তাব দেয় যে আমরা তোমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারি, তা হলে তারা প্রশাসনিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু এ কথা

www.pathagar.com

গোপন রাখতে হবে। তার মানে, তাদের ব্যক্তি-ক্ষমতার স্বার্থরক্ষাকারী মতে এবং বিশ্বাসে নিজেদের দীক্ষিত করতে হবে। এ দক্ষতা অর্জন করতে না-পারলে তারা ঐ গোষ্ঠীর অংশ হতে পারবে না। এ কারণেই শিক্ষা- ব্যবস্থার একটা ধরন ঐ রকম সব দায়িত্বশীল লোক এবং বিশেষজ্ঞ তৈরি করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। ব্যক্তি-ক্ষমতা ও তার প্রতিনিধি হিশেবে রাষ্ট্র ও কর্পোরেট চক্রের স্বার্থবোধে ও মূল্যবোধে তাদের গভীর ভাবে দীক্ষিত হতে হয়। তা যদি তারা পারে, তা হলে ঐ বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর অংশ হতে কোন অসুবিধে নেই। বাদবাকি মূলত যে-পশুর দল, তাদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে হবে, তাদের মন অন্য কোন দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। এ সবের থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। দেখতে হবে তারা যেন শুধু দর্শক হয়ে থাকে, আর মাঝে-মাঝে আসল নেতাদের মধ্যে পছন্দমতো কারও প্রতি সমর্থন জানিয়েই ক্ষান্ত হয়।

এই দৃষ্টিকোণ গড়ার কাজে আরও অনেকেই সাহায্য করেছেন। বস্তুত এ খুব প্রচলিত ধারণা। উদাহরণ হিশেবে যেমন বলা যায়, ধর্মতত্ত্ববিদ ও বৈদেশিক নীতির অন্যতম সমালোচক রাইনহোল্ড নিয়েবুর-এর কথা, যাঁকে কখনও-কখনও 'প্রতিষ্ঠানের ধর্মতত্ত্ববিদ' নামেও ডাকা হয়। জর্জ কেন্নান ও কেনেডি-গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীদের গুরু হিশেবে পরিচিত এই ভদ্রলোক বলেছেন যে বিচক্ষণতা খুবই সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ দক্ষতা, খুব অল্প সংখ্যক লোকেরই এই গুণ আছে। বেশির ভাগ লোকই স্রেফ আবেগ আর ঝোঁকের বশে চলে। ফলে আমাদের, যাদের এই বিচক্ষণতা আছে, 'প্রয়োজনীয় বিভ্রম' ও ভাবাবেগে ভরা 'অতি-সরলতা' সৃষ্টি করে শাদাসিধে নির্বোধ এই সব লোককে মোটামুটি ঠিক পথে রাখতে হবে। তৎকালীন রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বড়-সড় একটা অংশের এই ছিল মূল কথা। ১৯২০ ও ৩০-এর যুগের প্রথমার্ধে আধুনিক সংযোগক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও আমেরিকার অগ্রণী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাসওয়েল যেমন বলেছেন যে, 'জনতাই তার নিজ-স্বার্থের শ্রেষ্ঠ বিচারক— গণতান্ত্রিক এই গোঁড়ামি'র কাছে কেন আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়। কেন না, তারা আদৌ তা নয়। জনস্বার্থের আমরাই শ্রেষ্ঠ বিচারক। ফলে, স্রেফ সাধারণ নৈতিকতার দিক থেকেই, যাতে তারা অবিবেচনার ভিত্তিতে কাজ করার কোন সুযোগ না-পায়, তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। আজ যাকে

www.pathagar.com

একচ্ছত্র ব্যবস্থা বা সামরিক রাষ্ট্র বলে, তাতে এ কাজ অনেক সহজ। স্রেফ একটা ডাণ্ডা তাদের মাথার ওপর ধরে থাকুন, আর সীমা অতিক্রম করলেই সেটা তাদের মাথায় মারুন। কিন্তু এখন, যখন সমাজ অনেক বেশি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক, সে ক্ষমতা আর নেই। সুতরাং এখন আপনাকে প্রচারকৌশলের দিকে মুখ ফেরাতে হবে। যুক্তিটা পরিষ্কার। একচ্ছত্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমন ডাণ্ডা, গণতন্ত্রে তেমনি প্রচার। এটাই ভালো, এটাই বুদ্ধিমত্তার কাজ, কেন না আবারও, হতবুদ্ধি ঐ পশুর পাল সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারে অজ্ঞ, ও সব তারা ঠিক বুঝতে পারে না।

জন-সংযোগ

জন-সংযোগকে উৎপাদনী শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পথিকৃৎ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। 'জনতার মনকে নিয়ন্ত্রণ করা' বা বশে রাখাটাই এর কাজ, নেতারা সে ভাবেই এর বর্ণনা করেছেন। ক্রিল কমিশনের সাফল্য এবং লাল আতঙ্ক তৈরি ও তার ফলাফল থেকে তারা অনেক কিছু শিখেছেন। জন-সংযোগের কারখানার সে সময়ে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ১৯২০-র দশকে বেশ কিছু কাল তার দাপটে জনতা প্রায় পুরোপুরি ব্যবসায়িক শ্রেণীর শাসনাধীন হয়ে পড়ে। এবং তা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় যে ১৯৩০-এর দশকে প্রবেশ করার মুখে কংগ্রেসনাল কমিটি এ নিয়ে তদন্ত শুরু করে। এ সম্পর্কে বহু তথ্য আমরা সেখান থেকেই পেয়েছি।

জন-সংযোগ এক বৃহৎ শিল্প। এ বাবদে এখন বছরে বিলিয়ন ডলারের হিশেবে খরচ হয়। *জনতার মনকে নিয়ন্ত্রণ করা*-টাই তার বরাবরের দায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যেমন, তেমনি ১৯৩০-এর দশকেও বিরাট-বিরাট সব সমস্যা মাথা চাড়া দেয়। ব্যাপক মন্দার পাশাপাশি শ্রমিকরাও তখন রীতিমতো সংগঠিত। বস্তুত, ভাগনার আইনের সূত্রে ১৯৩৫ সালে তারা প্রথম সংগঠিত হওয়ার অধিকার অর্জন করে—সেটাই তাদের প্রথম গুরুতর আইনি জয়। এর থেকে দুটো বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়। তার একটা তো এই যে, এর মানে

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের কাজে কোথাও গলদ হচ্ছে। নির্বোধ পশুর দল আইনের পথে জিতে যাচ্ছে — ঐ তো হওয়ার কথা নয়। আর-একটা সমস্যা হল, এর ফলে লোকে সংগঠিত হতে শুরু করে। জনগণকে অবশ্যই ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন এবং একা করে দিতে হবে। তাদের তো সংগঠিত হওয়ার কথা নয়, কারণ তা হলে নিছক দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করে তারা আরও কিছু চেয়ে বসবে। যদি সামান্য রসদ নিয়ে বহু লোক রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করার জন্য একত্র হতে পারে, তা হলে তো তারা তাতে অংশও নেবে। এটা সত্যি ভয়ের। তা, এটাই যেন শ্রমিকদের শেষ আইনি জয় হয় এবং জন-সংগঠনগুলির গণতান্ত্রিক বিচ্যুতির এটাই যেন শেষের শুরু হয়, তা সুনিশ্চিত করতে অতএব ব্যবসায়িক মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। আর, তাতে কাজও হয়। সেটাই ছিল শ্রমিকদের শেষ আইনগত জয়। তার পর থেকে— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন ইউনিয়নে সদস্যের সংখ্যা খানিক বাড়লেও— তার পর থেকেই তা কমতে শুরু করে ও ইউনিয়নের মধ্যে দিয়ে কাজ করার ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে কমে। এ কোন দুর্ঘটনার ফল নয়। এ বার আমরা সেই ব্যবসায়িক গোষ্ঠী নিয়ে কথা বলব, যারা জন-সংযোগের এই বৃহৎ শিল্প এবং ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ম্যানুফ্যাকচার, বিজনেস রাউন্ডটেবল ইত্যাদির মতো নানান সংস্থার মাধ্যমে এ জাতীয় সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য অজস্র টাকা, বিস্তর মনোযোগ ও বহু চিন্তা ব্যয় করে। এ ধরনের গণতান্ত্রিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে কোন একটা পথ খুঁজে বের করতে সে সময়ে প্রায় তৎক্ষণাৎ তারা কাজেও নেমে পড়ে।

এর প্রথম পরীক্ষাটা হয় এক বছর পর, ১৯৩৭ সালে। পশ্চিম পেনসিলভানিয়ার জনসটাউনে সে সময়ে একটা বড় ইস্পাত ধর্মঘট হয়। ব্যবসায়িক গোষ্ঠী সেখানে শ্রমিকদের ঐক্য ধ্বংস করার জন্য এক নতুন কৌশল প্রয়োগ করে, যাতে দারুণ কাজ হয়। গুণ্ডার দল লেলিয়ে বা পা ভেঙে দিয়ে নয়। ওতে আর তেমন কাজ হচ্ছিল না তখন। তার চেয়ে ঢের সূক্ষ্মতর ও কার্যকর উপায়ে-স্রেফ প্রচার চালিয়ে। পরিকল্পনাটা ছিল, এমন কোন পথ খুঁজে বার করো, যাতে ধর্মঘটীরা সাধারণ লোকের সমর্থন হারায়। বিশৃঙ্খলাকামী, ক্ষতিকর ও সাধারণ স্বার্থের বিরোধী পক্ষ হিশেবে তাদের হাজির করা যায়। সাধারণ স্বার্থ মানে 'আমাদের' স্বার্থ—ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও

www.pathagar.com

ঘরের বউদের স্বার্থ। সবাই 'আমরা'। আমরা একত্রে থাকতে চাই, ঐক্য ও আমেরিকানিজম-এর মতো সব জিনিশ চাই, একসঙ্গে কাজ করতে চাই। ঐ ধর্মঘটীরা, ওরা খারাপ, ওরা বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে, ঝামেলা পাকাচ্ছে, ঐক্য নষ্ট করছে আর আমেরিকানিজম-এর দফারফা করে ছাড়ছে। ওদের থামাতে হবে, থামাতে হবে যাতে আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে হেসে-খেলে বাঁচতে পারি। কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ থেকে যে-লোকটা ঘরে ঝাঁট দেয়—তাদের সকলের স্বার্থই নাকি এক। আমরা সকলে একসঙ্গে কাজ করতে পারি, দ্বিধাহীন পছন্দের আবেগে আমেরিকানিজম-এর স্বার্থে একযোগে কাজ করতে পারি। এই হল মূল কথা। এটাকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে পেশ করতে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়। সে তো হবেই, কারণ শেষ পর্যন্ত এরা সবাই ব্যবসায়ী লোক, গণমাধ্যমকে এরাই বশে রাখে, আর এদের রসদও প্রচুর। এবং এতে কাজ হয়, দারুণ কাজ হয়। এটাই পরে 'মোহক উপত্যকার সূত্র' (বা মোহক ভ্যালি ফর্মুলা) নামে পরিচিত হয় এবং ধর্মঘট ভাঙার জন্য নানা জায়গায় বার বার তা ব্যবহার করা হয়। আমেরিকানিজম-এর মতো জলো আর ফাঁপা সব ধারণার সমর্থনে জনমত গড়ে তোলার সময়েও 'ধর্মঘট ভাঙার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' রূপে কথিত এ সবে ভালোই কাজ হত। কে এর বিরোধিতা করবে? অথবা ধরুন, ঐক্য। কে বিরোধিতা করতে যাবে? অথবা পারস্য উপসাগরের যুদ্ধকালে : 'আমাদের সেনাদলকে সমর্থন করুন।' কে এর বিরোধিতা করবে কে ? অথবা সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ, বোকা-বোকা এই সব। কে করবে?

আসলে কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, আইওয়ার-র লোকেদের কি আপনি সমর্থন করেন?-কী তার অর্থ ? আপনি কি বলবেন যে, হ্যাঁ, আমি তাদের সমর্থন করি, অথবা না, সমর্থন করি না। এটা আসলে কোন প্রশ্নই নয়। এর কোন মানে নেই। আর এ-ই হল আসল কথা। জন-সংযোগের এ সব শ্লোগান, যেমন 'আমাদের সেনাকে সমর্থন করুন'-কথাটা হল, এ সবের আসলে কোন অর্থ নেই। আপনি আইওয়া-র লোকেদের সমর্থন করেন, না বিরোধিতা করেন, এ-ও একই রকম অর্থহীন। অবশ্য এর মধ্যে কথা একটা ঠিকই আছে। কথাটা হল এই যে, আপনি কি আমাদের সব নীতিকে সমর্থন করেন? কিন্তু তা বলে আপনি চান না যে লোকে তা নিয়ে ভাবুক। ভালো

www.pathagar.com

প্রচারের এই হল মোদ্দা কথা। আপনি এমন একটা শ্লোগান তৈরি করতে চান, কেউ যার বিরোধিতা করবে না, বরং সকলে সমর্থন করবে। কেউ জানে না তার অর্থ কী, কারণ আসলে তার কোন অর্থ নেই। আসলে যার কোন অর্থ *আছে*, সে দিক থেকে আপনার মনোযোগ সরিয়ে দেওয়াতেই তার আসল মূল্য। সেটা হল এই যে, আপনি কি আমাদের নীতি সমর্থন করেন? এ নিয়ে কথা বলার কোন অধিকার আপনার নেই। সেনাদলকে সমর্থন করা বা না-করা নিয়ে লোকে কী বলবে? 'তাদের আমরা সমর্থন না-করতে পারি না নিশ্চয়ই।' এখানেই আপনি জিতলেন। আমেরিকানিজম ও ঐক্য নিয়ে এটাই তো কথা। আসুন, সকলে একসঙ্গে থাকি, ফাঁকা শ্লোগান দিই, আসুন সকলে হাতে হাত মেলাই, আসুন সবাই মিলে এ অবস্থা সুনিশ্চিত করি যেখানে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা, অধিকারের কথা বা ঐ জাতীয় সব কথা বলে বাজে লোকেরা আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারবে না।

এ সবই খুব কার্যকর। আজও তা-ই চলছে। আর এ সবই খুব সতর্ক বিবেচনার ফল। জন-সংযোগের শিল্পক্ষেত্রে যারা আছেন, তারা কেউ সেখানে মজা মারার জন্য বসে নেই। তারা রীতিমতো কাজ করছেন সেখানে। তারা লোকের মনে সঠিক মূল্যবোধ চারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বস্তুত প্রকৃত গণতন্ত্র সম্পর্কে তাদের একটা ধারণা আছে: এ ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যেখানে বিশেষজ্ঞদের প্রভুর স্বার্থে কাজ করার শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রভু মানে এই সমাজটা যাদের। জনগণের বাদবাকি অংশকে যে-কোন সংগঠন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, কারণ সংগঠন মাত্রেই ঝামেলা পাকায়। টিভির সামনে এদের একা বসিয়ে রাখতে হবে আর মাথায় এ কথা ঢুকিয়ে দিতে হবে যে জীবনের একমাত্র অর্থ হল চারপাশে আরও-আরও পণ্য জোটাও বা ঐ ধনী মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো জীবন কাটাও, যা তুমি টিভি-র পর্দায় দেখছ এবং ঐক্য ও আমেরিকানিজম-এর মতো মিষ্টি-মিষ্টি সব মূল্যবোধ নিয়ে বাঁচো। জীবনে এ ছাড়া আর কিছু নেই। জীবনে যে এ ছাড়া আরও কিছু আছে, এ আপনার মনে হতেই পারে, কিন্তু যেহেতু এ সবই আপনি একাকী বসে দেখছেন, ফলে আপনার মনে হবে যে আপনি বোধ হয় পাগল, কারণ ওখানে এ ছাড়া তো আর কিছু নেই, আর কিছু তো দেখাচ্ছে না। এবং যেহেতু কোন রকম সংগঠনই অনুমোদিত নয়— এ কথাটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ—তাই আপনি

www.pathagar.com

পাগল কি না তা আপনার বোঝার সত্যি কোন উপায় নেই। আপনি যে নিজেকে পাগল বলে মনে করছেন, তার কারণ এ ক্ষেত্রে তা মনে করাটাই স্বাভাবিক।

তা হলে, এ-ই হল আদর্শ। এ আদর্শে পৌঁছনোর জন্যই এত প্রয়াস, এত উদ্যোগ। অবশ্যই এর পেছনে নির্দিষ্ট কিছু ধারণা আছে। গণতন্ত্রের ধারণা—যার কথা আমি আগেই বলেছি। নির্বোধ ঐ পশুর দল অবশ্য একটা সমস্যা। তাদের গর্জন আর পদদলন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে। অন্য কোন দিকে তাদের মনোযোগ ঘুরিয়ে দিতে হবে। তারা ঐ সুপারব্যোল বা সিটকম বা হিংস্র ঐ সব ছবি দেখুক। মাঝে-মধ্যে শুধু 'আমাদের সৈন্যদের সমর্থন করুন' গোছের অর্থহীন কিছু শ্লোগান দেওয়ার জন্য তাদের আপনি আহ্বান জানাবেন। আপনাকে তাদের সব সময়ে বেশ ভয়ের মধ্যে রাখতে হবে, কারণ তারা যদি নানা রকমের দুর্বৃত্ত, যারা বাইরে থেকে বা ভেতর থেকে বা অন্য যে-কোন জায়গা থেকে এসে তাদের ধ্বংস করতে উদ্যত, তার ভয়ে সব সময়ে ভীত বা আতঙ্কিত না-থাকে, তা হলেই তারা ভাবতে শুরু করবে। সেটা খুবই বিপজ্জনক, কারণ তারা তো তার উপযুক্ত নয়। ফলে তাদের মনোযোগ অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া এবং বরাবরের জন্য তাদের প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে রেখে দেওয়াটা জরুরি।

এ হল গণতন্ত্রের একটা ধারণা। বস্তুত, আবার যদি ঐ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কথায় ফিরে যাই তো বলতে হয়, শ্রমিকদের শেষ আইনি জয় সেই ১৯৩৫ সালে, ভাগনার আইনের সময়েই ঘটেছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইউনিয়নগুলো ক্ষইতে শুরু করল, আর সেই সূত্রে ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত খুবই সমৃদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর যে-কৃষ্টি, তারও ক্ষয় শুরু হল। তাকে ধ্বংস করা হল। ব্যবসায়ী গোষ্ঠী-পরিচালিত এক সমাজের দিকে আমরা এগিয়ে গেলাম লক্ষণীয় মাপে। এ হল রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক এক শিল্পপ্রধান সমাজের কথা, তুলনীয় অন্যান্য সমাজের মতো যেখানে এমনকী স্বাভাবিক কোন সামাজিক চুক্তি পর্যন্ত নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরে, আমার সন্দেহ, এ হল এক মাত্র শিল্পোন্নত সমাজ, যেখানে জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। যারা এ সব নিয়ম অনুসরণ করতে পারে না এবং যা-কিছু করে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই করে, জনসংখ্যার সেই অংশের জীবন-ধারণের ন্যূনতম মানের প্রতিও এখানে

www.pathagar.com

কোন সাধারণ দায়বদ্ধতার ব্যাপার নেই। ইউনিয়নগুলো প্রায় অস্তিত্বহীন। জনকাঠামোর অন্য অংশেরও সেই অবস্থা। রাজনৈতিক কোন দল বা সংগঠন নেই। অন্তত কাঠামোগত দিক থেকে বলা যায়, চূড়ান্ত লক্ষ্যের অনেকটাই হাশিল করা গেছে। গণমাধ্যম একচেটিয়া কর্পোরেট-এর করায়ত্ত। তাদের দৃষ্টিকোণেও কোন পার্থক্য নেই। এ হল সেই একই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দুটি অংশ। জনগণের বেশির ভাগ অংশই আর ভোট দেয়ার ঝামেলায় যেতে চায় না, কারণ সেটা অর্থহীন। তাদেরকে প্রান্তিকতর অবস্থানে ঠেলে দেওয়া গেছে এবং যথাযথ ভাবে তাদের মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়া গেছে। এটাই তো লক্ষ্য। জন-সংযোগ কারখানার অন্যতম ব্যক্তিত্ব এডওয়ার্ড বার্নেস প্রকৃতপক্ষে এসেছেন সেই ক্রিল কমিশন থেকে। তিনি তারই অংশ ছিলেন, সেখান থেকেই শিক্ষা নিয়েছেন এবং তাকে আরও উন্নত করার দিকে এগিয়েছেন, যাকে তিনি 'সম্মতি তৈরি করা'র কৌশল বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে এই হল 'গণতন্ত্রের নির্যাস'।

এখন, সম্মতি তৈরি করতে পারেন তারাই, যাদের হাতে সেই সম্পদ ও ক্ষমতা আছে—অর্থাৎ সেই ব্যবসায়িক গোষ্ঠী—তাদের হয়েই তো আপনি কাজ করছেন।

মতামত তৈরির কৌশল

বৈদেশিক অভিযানের সমর্থনেও জনতাকে উত্তেজিত করতে হয়। জনতা সাধারণত শান্তিপ্রিয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েও তারা তা-ই ছিল। বিদেশ-অভিযান, হত্যা, অত্যাচার— এ সবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কোন কারণই তারা দেখতে পায় না। ফলে রজরদবিস্ত তাদের চাগাতে হয়। আর তা করার জন্য তাদের রীতিমতো ভয় দেখাতে হয়। এ ব্যাপারে বার্নেস-এর নিজেরই একটা বিরাট সাফল্য আছে। ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালার পুঁজিবাদী-গণতান্ত্রিক সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সেখানে এক নৃশংস ঘাতকের সমাজ প্রতিষ্ঠা করে, তখন ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি-র পক্ষে বার্নেস-ই ছিলেন জন-সংযোগের দায়িত্বে। সে সমাজ আজও ঠিক একই রকম আছে,

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের শূন্যগর্ভতা থেকে যাতে তার কোন বিচ্যুতি না-হয় তা নিশ্চিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সেখানে ক্রমাগত সাহায্য পাঠিয়ে যাচ্ছে। এমন সব অভ্যন্তরীণ কর্মসূচির মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে ক্রমাগত আঘাত করে যাওয়া দরকার, জনগণ যার বিরোধী। যে-অভ্যন্তরীণ কর্মসূচি তাদের পক্ষে ক্ষতিকর, তার পক্ষে থাকার কোন কারণও তাদের নেই। এখন, *এর* জন্যেও ব্যাপক প্রচার দরকার। গত দশ বছর ধরে এ সব আমরা প্রচুর দেখেছি। রেগন-এর কর্মসূচি যেমন ভীষণ অপ্রিয় ছিল। ১৯৮৪ সালে 'রেগন ধ্বস'-এর সময়ে প্রতি তিন জন নির্বাচকের মধ্যে অন্তত দু-জন আশা করেছিল যে তাঁর নীতিগুলো শেষ পর্যন্ত চালু হবে না। যদি আপনি যুদ্ধাস্ত্র, সামাজিক খাতে খরচ কমানো ইত্যাদির মতো নির্দিষ্ট সব কর্মসূচির কথা ধরেন তো দেখবেন, জনগণ এর প্রায় প্রত্যেকটার ভয়ানক বিরোধী। কিন্তু লোকে যত ক্ষণ প্রান্তীয় ও বিক্ষিপ্ত, নিজেদের সংগঠিত করার বা নিজেদের মনোভাব প্রকাশের কোন পথ যত ক্ষণ তাদের জানা নেই, এমনকী অন্যদের এ মনোভাব আছে কি না সে কথা পর্যন্ত জানার উপায় নেই, তত ক্ষণ পর্যন্ত যারা বলে যে তারা সামরিক খাতের চেয়ে সামাজিক খাতে বেশি খরচের পক্ষপাতী, অথবা যারা নির্বাচনে এই মতের পক্ষেই সায় দিয়েছিল- যা লোকে ব্যাপক ভাবেই দিয়েছিল, তারা প্রত্যেকে ভেবেছিল এ ধরনের উদ্ভট ভাবনা শুধু তাদের মাথাতেই কাজ করছে। অন্য কোনখান থেকে এ সব তারা কক্ষনো শোনেনি। এ সব কারও ভাবারই কথা নয়। ফলে আপনি যদি এ সব ভাবেন ও নির্বাচনের সময়েও তা প্রকাশ করতে অকুণ্ঠ হন, তা হলে নিজেকে তো আপনি একটু অদ্ভুত ভাববেনই। যেহেতু আপনার এ মত যারা সমর্থন করতে পারে, তাকে আরও জোরালো করে তুলতে পারে ও তা প্রকাশ করার সময়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারে, তাদের সঙ্গে একত্র হওয়ার কোন পথ নেই আপনার, ফলে নিজেকে আপনার একটু অদ্ভুত বা বেয়াড়া তো মনে হবেই। অতএব, একপাশে সরে দাঁড়ান আপনি, এবং যা চলছে তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিন। বরং অন্য কিছু দেখুন— যেমন ধরুন— সুপারব্যোল।

তা হলে, খানিকটা হলেও, ঐ লক্ষ্যে পৌঁছনো গেছে, কিন্তু তা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। এখনও এমন কিছু প্রতিষ্ঠান রয়ে গেছে, যা ধ্বংস করা যায়নি। যেমন ধরা যাক, গির্জাগুলো এখনও আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিরুদ্ধবাদী

www.pathagar.com

কার্যকলাপের একটা বড় অংশই গড়ে ওঠে গির্জার ভেতর, আর সেটা শুধু এই কারণে যে গির্জাগুলোই এখনও এ দেশে আছে। সুতরাং আপনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে ইয়োরোপের কোন দেশে গেলে খুব সম্ভব সে বক্তৃতা হবে কোন ইউনিয়ন-এর সভাঘরে। কিন্তু এখানে মোটেই তা হবে না, কারণ প্রথমত এখানে আর ইউনিয়নের প্রায় কোন অস্তিত্ব নেই, আর যদি থাকেও, তবে তার কোন রাজনৈতিক চরিত্র নেই। কিন্তু গির্জাগুলো আছে, ফলে আপনাকে প্রায়শ সেখানেই বক্তৃতা দিতে যেতে হয়। মধ্য আমেরিকার সলিডারিটি-র কাজ প্রায় অধিকাংশই গড়ে উঠেছে গির্জাকে কেন্দ্র করে, শুধু এই কারণে যে এখনও তা আছে।

হতবুদ্ধি ঐ পশুর দল অবশ্য কখনওই পুরোপুরি বশ মানে না, ফলে এ এক চিরকালীন লড়াই। ১৯৩০-এর দশকে তারা আবার মাথা চাড়া দেয় এবং তা দমন করা হয়। ১৯৬০-এ বিরোধিতার আর-এক ঢেউ আসে। একটা নামও দেওয়া হয় তার। বিশেষজ্ঞরা একে 'গণতন্ত্রের সংকট' বলে চিহ্নিত করে। গণতন্ত্র সে সময়ে এক সংকটের মধ্যে পড়েছে বলে মনে করা হয়। সংকটটা এই যে, জনগণের একটা বড় অংশ তখন সংগঠিত ও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করে। এখন, ফের আমরা গণতন্ত্রের সেই দুটো ধারণার কথায় ফিরে যাই। অভিধানের সংজ্ঞা অনুযায়ী এ ঘটনা নিশ্চয়ই গণতন্ত্রের দিকে এক পা *এগোনো*। কিন্তু প্রচলিত ধারণায় এ এক *সমস্যা*, একটা সংকট, যা অতিক্রম করাটা জরুরি। জনতাকে অবশ্যই তাড়া করে ফেরত পাঠাতে হবে উদাসীনতা, বাধ্যতা আর নিষ্ক্রিয়তার জগতে—ঐ তাদের যথার্থ অবস্থান। এ সংকট কাটানোর জন্য ফলে কিছু-একটা করতে হবে আমাদের। সে বাবদে চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু তা কাজে লাগে না।

গণতন্ত্রের সংকট এখনও রয়েছে, হ্যাঁ, সৌভাগ্যবশত, যদিও নীতির ক্ষেত্রে বদল আনার মতো তা কার্যকর নয়। কিন্তু লোকের মতামত বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তা এখনও কার্যকর। বহু লোকই যদিও তা বিশ্বাস করতে পারে না।

১৯৬০-এর পর এ ব্যাধি সারানোর জন্য, তার অভিমুখ বদলে দেওয়ার জন্য বিরাট উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ ব্যাধির একটা দিককে চিহ্নিত করতে সে

www.pathagar.com

সময়ে এর একটা বিশেষ নামও স্থির করা হয়। একে বলে 'ভিয়েতনাম সিনড্রোম'। পরিভাষা হিশেবে কথাটা উঠে আসে ১৯৭০ নাগাদ, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তা সংজ্ঞায়িত হয়। রেগনবাদী বুদ্ধিজীবী নর্ম্যান পোডরেৎস একে 'সামরিক শক্তির ব্যবহারে এক অসুস্থ জড়তা' বলে বর্ণনা করেন। হিংসার ব্যবহার নিয়ে জনতার এক বৃহৎ অংশের মধ্যেই এই অসুস্থ জড়তা ছিল। লোকে বুঝতেই পারত না যে কেন আমরা খামোকা কিছু লোকের ওপর অত্যাচার করব, তাদের খুন করব, তার পর ধারসে তাদের ওপর বোমা মারব।

এ ধরনের অসুস্থ জড়তায় আক্রান্ত হওয়াটা তো বিপজ্জনক। গ্যোবেলস তা ঠিক বুঝেছিলেন, কারণ তা হলে অন্য দেশ আক্রমণ করার ক্ষেত্রে একটা সীমাবদ্ধতা আসতে বাধ্য।

জনতার মনে 'সামরিক মূল্যবোধে'র প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব ঢুকিয়ে দেওয়াটা জরুরি, *ওয়াশিংটন পোস্ট* উপসাগরীয় যুদ্ধ নিয়ে উন্মাদনার সময়ে বেশ গর্বের সঙ্গেই এ কথা লিখেছিল। বিষয়টা গুরুতর। যদি আপনি এমন এক হিংস্র সমাজ চান, যা তার দেশের উচ্চবর্গীয় গুটিকয়েক লোকের স্বার্থরক্ষার জন্য গোটা দুনিয়া জুড়ে বলপ্রয়োগ করবে, তা হলে সামরিক মূল্যবোধের যথাযথ সমঝদারি এবং হিংসার ব্যবহার নিয়ে এ রকম কোন অসুস্থ জড়তা না-থাকাটা আবশ্যিক। এই হল ভিয়েতনাম সিনড্রোম। এ বাধা এড়িয়ে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে।

উপস্থাপিত বাস্তবই প্রকৃত বাস্তব

ইতিহাসকে পুরোপুরি বিকৃত করাটাও সমান দরকারি। এ হল ঐ অসুস্থ জড়তাকে ঝেড়ে ফেলার একটা পথ—অর্থ্যাৎ আমরা যখন কাউকে আক্রমণ করছি, তাকে ধ্বংস করছি, তখন তা দেখে যেন মনে হয় যে আমরা তখন ভয়ঙ্কর আগ্রাসী কোন দানব বা ঐ রকম কোন কিছুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করছি মাত্র। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর থেকে এর ইতিহাস নতুন করে নির্মাণের জন্য *ব্যাপক* উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সত্যি কী চলছে, বড় বেশি

www.pathagar.com

লোক তা বুঝে ফেলছিল। এ মধ্যে অনেক সৈন্যও ছিল, ছিল প্রচুর তরুণ-তরুণী, যারা শান্তি আন্দোলন-সহ অন্যান্য নানা আন্দোলনে যুক্ত ছিল। এ খুব খারাপ। এ রকম খারাপ সব চিন্তার পুনর্বিন্যাস দরকার, দরকার কিছুটা সুস্থতা ফিরিয়ে আনা—অর্থাৎ আমরা যা করছি, তা ঠিক করছি এবং তার উদ্দেশ্য খুব মহৎ— দরকার এই স্বীকৃতির। যদি আমরা দক্ষিণ ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ করে থাকি, তবে তা করেছি অন্যের হাত থেকে সেই দেশটাকে রক্ষা করার জন্যে। অন্যের হাত থেকে মানে দক্ষিণ ভিয়েতনামিদের হাত থেকেই নিশ্চয়ই, কারণ তখন সেখানে আর কেউ ছিল না। দক্ষিণ ভিয়েতনামে 'অভ্যন্তরীণ আগ্রাসনে'র বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা—কেনেডি-র বুদ্ধিজীবীরা এ কথাই তখন বলেছিল। অ্যাডলে স্টিভেনসন ও অন্যান্যরা ঠিক এ কথাটাই ব্যবহার করেছিল। এ ছবিটাই সর্বজনের বোধগম্য ও সরকারি করে তোলার দরকার ছিল। এতে কাজও হয়েছিল চমৎকার। গণমাধ্যম ও শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ যখন অখণ্ড এবং মেধা যখন প্রচলিত ধারার অনুসারী, তখন তা সম্ভবও। এর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় সাম্প্রতিক উপসাগরীয় সংকটের প্রতি লোকের মনোগতিক নিয়ে মাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সমীক্ষা থেকে। সমীক্ষাটা ছিল টেলিভিশন দেখার সময়কার মনোভাব আর বিশ্বাসের ধরন নিয়ে। সেখানে একটা প্রশ্ন ছিল, ভিয়েতনাম যুদ্ধে মোট কত জন ভিয়েতনামি মারা গেছেন বলে আপনার মনে হয় ? আজকের আমেরিকানদের পক্ষ থেকে গড় উত্তর ছিল, এক লাখ। সরকারি সংখ্যাটা হল প্রায় বিশ লাখ। প্রকৃত সংখ্যাটা সম্ভবত ত্রিশ বা চল্লিশ লাখ। সমীক্ষাটা যারা করেছিলেন, এর পর তারা একটা যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন তুলেছেন—যদি আজ আপনি কোন জার্মান লোককে জিজ্ঞেস করেন যে হলোকস্ট-এ কত জন ইহুদি মারা গিয়েছিল, আর সে বলে যে সংখ্যাটা তিন লাখ—তবে জার্মান রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা কী হবে? তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে এর থেকে আমরা কী বুঝব? তারা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি, কিন্তু আপনি প্রশ্নটাকে ধরে এগোতে পারেন। এ রকম ভুল ধারণা থেকে আমরাই বা আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে কী বুঝি? বুঝি অনেক কিছু। বুঝি যে সামরিক শক্তির ব্যবহার নিয়ে অসুস্থ জড়তা ও অন্যান্য সব গণতান্ত্রিক বিচ্যুতি আমাদের অতিক্রম করা দরকার। আগের ঘটনায় এতে কাজ হয়েছিল। প্রত্যেকটা ঘটনার ক্ষেত্রেই এ

www.pathagar.com

কথা সত্যি। ইচ্ছেমতো যে-কোন একটা ঘটনা বাছুন— মধ্য প্রাচ্য, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস, মধ্য আমেরিকা—ঘটনা যা-ই হোক, জনতার চোখে দুনিয়ার যে-ছবি তুলে ধরা হচ্ছে তার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। মিথ্যের প্রাসাদের ওপর মিথ্যের আরও প্রাসাদ তৈরি করে তার নিচে বিষয়ের সত্যকে কবর দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার শর্তে গণতন্ত্রের বিপদ নিবারণ করার দিক থেকে এ সমস্তই দারুণ সফল। ব্যাপরটা খুব চিত্তাকর্ষকও বটে। এ কোন একচ্ছত্র রাষ্ট্র নয় যে বলপ্রয়োগ করে এ কাজ করা যাবে। এ সমস্তই স্বাধীনতার শর্তে অর্জিত সাফল্য। যদি আমরা আমাদের আপন সমাজকে বুঝতে চাই, তবে এ সমস্ত ঘটনা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। এ সবই গুরুতর ঘটনা, গুরুতর তাদের কাছে, যারা কী ধরনের সমাজে তারা বাস করছে, তা নিয়ে ভাবিত।

বিরোধিতার সংস্কৃতি

এতৎসত্ত্বেও বিরোধিতার সংস্কৃতি বেঁচে আছে। ১৯৬০-এর দশকের পর থেকে তা অনেক বেড়েছে। ৬০-এর দশকে তার বিকাশ ছিল খুবই শ্লথ। দক্ষিণ ভিয়েতনামে বোমাবাজি শুরু করার অনেক পরে পর্যন্ত ইন্দোচিনের যুদ্ধ নিয়ে কোন প্রতিবাদ হয়নি। অবশেষে যখন তা শুরু হল, তখনও বিরোধিতার এ আন্দোলন খুবই ক্ষীণ, ছাত্রই বেশি, বাদবাকিরাও কমবয়সী। ৭০-এর দশকের মধ্যে তার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সে সময়ে জনপ্রিয় নানান উল্লেখযোগ্য আন্দোলন গড়ে ওঠে : পরিবেশ আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন, পরমাণু অস্ত্র-বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি। ১৯৮০-র দশকে এ ধরনের সংহতি আন্দোলন আরও বড় আকারে ছড়িয়ে পড়ে, বিরোধিতার মার্কিন ইতিহাসে তো বটেই,এমনকী হয়তো বিশ্ব-ইতিহাসেও যা নতুন ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্ত আন্দোলন শুধু প্রতিবাদ করে সরে যায়নি, বরং দুনিয়ার অন্যত্র আর্ত, নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে, অনেক সময়েই বেশ গভীর ভাবে। এ থেকে তারা নিজেরা যেমন বহু কিছু শিখেছে, তেমনি আমেরিকার মূলস্রোতের সংস্কৃতিও এর প্রভাবে কিছুটা সভ্য হয়েছে। এ সমস্তই বিরাট

www.pathagar.com

পার্থক্য গড়ে দেয়। এ ধরনের কাজের সঙ্গে বহু বছর ধরে যুক্ত প্রত্যেকে নিশ্চয়ই তা জানেন। আমি নিজে জানি, যে-জাতের বক্তৃতার আজ আমি মধ্য জর্জিয়া বা গ্রামীণ কেনটাকি-র মতো এ দেশের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সব অঞ্চলে দিচ্ছি, শান্তি-আন্দোলনের তুঙ্গ পর্যায়ে সবচেয়ে সক্রিয় শান্তি-আন্দোলনের শ্রোতাদের সামনেও তা আমি বলতে পারতাম না। এখন আপনি যে-কোন জায়গায় এ সব বলতে পারেন। লোকে সে সবের সঙ্গে একমত হতে বা না-হতে পারে, কিন্তু এখন তারা অন্তত এটুকু বোঝে যে আপনি কী বলতে চাইছেন এবং একটা জায়গা অন্তত তৈরি হয়েছে যার ওপর দাঁড়িয়ে আপনি সওয়াল করতে পারেন।

যাবতীয় প্রচার সত্ত্বেও, চিন্তাকে বশে আনার ও সম্মতি তৈরির যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ সবই সভ্যতার প্রভাব। এত কিছু সত্ত্বেও লোকে চিন্তা করার দক্ষতা ও তলিয়ে ভাবার ইচ্ছে বর্জন করেনি। ক্ষমতার ব্যাপারে তাদের সন্দেহ জেগে উঠেছে। আরও বহু ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। হয়তো তার গতি মন্থর, হয়তো নিথর তার চলন, কিন্তু তবু তাকে ধরা-ছোঁয়া যায়, আর সেটা গুরুত্বপূর্ণ। গোটা দুনিয়ায় যা ঘটছে, সেখানে লক্ষণীয় পার্থক্য ঘটানোর পক্ষে তার গতি যথেষ্ট কি না, সেটা অবশ্য অন্য প্রশ্ন। পরিচিত একটা উদাহরণই নেওয়া যাক এর, বিখ্যাত লিঙ্গ-ব্যবধানের কথাই ধরুন। ১৯৬০-এর দশকে 'সামরিক গুণ' ও সামরিক শক্তির ব্যবহার নিয়ে অসুস্থ জড়তা সম্পর্কে নারী-পুরুষের মনোভাব ছিল একই, অর্থাৎ ৬০-এর দশকের প্রথম দিকে নারী-পুরুষের কেউই এ জাতীয় অসুস্থ জড়তায় ভুগত না। এ নিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল একই। প্রত্যেকে ভাবত যে অন্যত্র জনতাকে দমন করার জন্য হিংসার প্রয়োগে কোন ভুল নেই। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে এ মনোভাব পালটেছে। কোথাও এই অসুস্থ জড়তা কমেনি, বরং বেড়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য একটা ব্যবধান বেড়েছে এবং এখন তা রীতিমতো বড়সড় ব্যবধানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী তার মান প্রায় পঁচিশ শতাংশ। এর মধ্যে তা হলে কী এমন ঘটল? যা ঘটেছে তা হল, এর মধ্যেই আধা-সংগঠিত এক ধরনের জনপ্রিয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে, যার সঙ্গে মহিলারা যুক্ত—আমি বলতে চাইছি, নারীবাদী আন্দোলনের কথা। সংগঠনের একটা প্রভাব আছেই। এর অর্থ আপনি আবিষ্কার করছেন যে আপনি একা নন।

www.pathagar.com

আপনার মতো অনেকে একই কথা ভাবছে। এই সূত্রে আপনি আপনার চিন্তার জগতকে আরও জোরদার করতে পারছেন, আপনি যা ভাবছেন বা যা বিশ্বাস করছেন, সে বিষয়ে এই সূত্রেই আরও জানতে পারছেন। এ সমস্ত এমনিতেই খুব প্রথাহীন সংগঠন, ঠিক চিরাচরিত সদস্য-সংগঠনের মতো নয়, মেজাজ বা মর্জিটাই এখানে বড় কথা, পারস্পরিক লেনদেনটাই মুখ্য। এখন এর একটা লক্ষণীয় প্রভাবও আছে। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের বিপদ একবার যদি এই সব সংগঠন গড়ে উঠতে পারে, লোকে যদি শুধু টিভি-র পর্দায় চোখ রেখে বসে না-থাকে, তা হলেই লোকের মাথায় এ সব উদ্ভট চিন্তা খেলে যাবে, যেমন এই সামরিক শক্তির ব্যবহার নিয়ে অসুস্থ জড়তা— এ সব তৈরি হবে। কিন্তু তা হলে তো চলবে না, তা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, তা এখনও পেরনো যায়নি।

শত্রুদের কুচকাওয়াজ

আগের যুদ্ধ নিয়ে কথা বলার চেয়ে আমি বরং পরের যুদ্ধটা নিয়ে কিছু বলি, কারণ কখনও-কখনও নিছক প্রতিক্রিয়া দেখানোর চেয়ে প্রস্তুতি নেওয়াটা অনেক বেশি জরুরি। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুব লক্ষণীয় একটা ব্যাপার ঘটছে। দুনিয়ায় এই প্রথম দেশ নয়, যেখানে এমন হচ্ছে। দেশের ভেতরে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে, হয়তো তা বিপর্যয়ের দিকেই চলেছে। ক্ষমতায় যারা আছে, এ সব বিষয়ে কিছু করার কোন ইচ্ছে নেই তাদের। আপনি যদি প্রশাসনের গত দশ বছরের অভ্যন্তরীণ কর্মসূচির খতিয়ানটা একবার দেখেন—আমি এর মধ্যে গণতান্ত্রিক বিরোধীদের কথাও বাদ দিচ্ছি না— তা হলে দেখবেন যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, গৃহ ও কর্মহীনতা, অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যাবৃদ্ধি, কারাগার, শহরের ভেতরে অবস্থার অবনতি ইত্যাদির মতো ভয়াবহ সব সমস্যা নিয়ে কী করা যায়, সে ব্যাপারে কোন ভাবনা বা প্রস্তাবের বালাই নেই। এ সব সকলেরই জানা, এবং অবস্থা ক্রমশ আরও খারাপ হচ্ছে। জর্জ বুশ ক্ষমতায় আসার দু-বছরের মধ্যে আরও ত্রিশ লাখ শিশু দারিদ্র্যসীমা পেরিয়ে গেছে, ঋণ বাড়ছে, শিক্ষার মান কমছে, প্রকৃত

www.pathagar.com

মজুরি অধিকাংশের ক্ষেত্রে সেই ১৯৫০-এর শেষদিকের স্তরে ফিরে গেছে—অথচ এ ব্যাপারে কেউ কিছু করছে না। এই পরিস্থিতিতে হতবুদ্ধি পশুদলের চোখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে, কারণ এ সব যদি চোখে পড়তে শুরু করে, তা হলে তাদের তা পছন্দ না-ও হতে পারে, যেহেতু এ সবের ফলে কষ্ট পাচ্ছে তারাই। শুধু সুপারক্যোল আর সিটকম দেখার ব্যবস্থাটা তাদের পক্ষে যথেষ্ট না-ও হতে পারে। জবরদস্তি তখন তাদের মনে আপনাকে শত্রুর ভয় ঢুকিয়ে দিতে হবে। ৩০-এর দশকে যেমন হিটলার তাদের মনে ইহুদি আর জিপসিদের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আত্মরক্ষার জন্য তাদের গুঁড়িয়ে দিতে হয়েছিল। এ বাবদে আমাদেরও নানান উপায় আছে। গত দশ বছরে, এক বা দু-বছর পর-পরই এ জন্য একটা-না একটা বড়সড় দৈত্য তৈরি করা হয়, যার হাত থেকে আমাদের আত্মরক্ষা করাটা জরুরি। তার মধ্যে সহজলভ্য একটা তো বারে বারেই ব্যবহৃত হয়েছে—রুশরা। রুশদের বিরুদ্ধে সব সময়েই আত্মরক্ষার ধুয়ো তুলতে পারা যেত। কিন্তু শত্রু হিশেবে তাদের আকর্ষণ এখন কমে গেছে, তাদের ব্যবহার করাও তাই কঠিন হয়ে পড়েছে। আবার একটা নতুন শত্রু বানানো দরকার। এখন প্রকৃতপক্ষে কোন্ শত্রু আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, ঠিক করে তা বলতে না-পারর জন্য জর্জ বুশ-কে লোকে অযথাই সমালোচনা করছে। এ খুব অন্যায়। ৮০-র দশকের মধ্যপর্বের ঠিক আগে ঘুমনোর সময়ে একটাই রেকর্ড বাজিয়ে দিলে চলত : ঐ রুশিরা আসছে। কিন্তু সে রেকর্ড তিনি এখন হারিয়ে ফেলেছেন, ফলে নতুন কিছু দিয়ে সে ফাঁক তাকে ভরাতে হবে, রেগন-এর জন-সংযোগের যন্ত্রপাতি ঠিক যা করেছিল ৮০-র দশকে। তো, তৈরি হল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, নিষিদ্ধ মাদক-পাচারের দল, ক্ষিপ্ত আরব আর নয়া হিটলার সাদ্দাম হুসেন, সারা দুনিয়াকে যারা পদানত করতে উদ্যত। একের পর এক তারা আসতেই থাকে। আপনি জনগণকে ভয় দেখান, সন্ত্রস্ত করে তোলেন, শাসন আর এমন ভাবে চোখ রাঙাতে থাকেন যে তারা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরতে ভয় পায় এবং ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে। এর পর আপনি গ্রেনাদা, পানামা বা প্রতিরক্ষাহীন ঐ রকম কোন তৃতীয় বিশ্বের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দারুণ ভাবে জেতেন, পলক ফেলার আগেই যাদের আপনি ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারেন—আর সত্যি-সত্যি তা-ই ঘটে। এতে স্বস্তি ফেরে। ওঃ, একদম শেষ মুহূর্তে আমরা

www.pathagar.com

রক্ষা পেয়ে গেছি। এ হল অনেক উপায়ের একটা, যা দিয়ে হতবুদ্ধি ঐ পশুর দল তাদের চারপাশের ঘটনায় যাতে মন না-দেয়, আপনি তার ব্যবস্থা করতে পারেন, অন্য দিকে তাদের নজর ঘুরিয়ে দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এর পরে, খুব সম্ভব, আসছে কিউবা। তার জন্য দরকার বে-আইনি অর্থনৈতিক লড়াই জারি রাখা, সম্ভবত আরও দরকার এক অসাধারণ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের পুনরুত্থান ঘটা। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাটা সংগঠিত করে কেনেডি প্রশাসন, কিউবার বিরুদ্ধে সেই অপারেশন মংগুস বা নেউল কাণ্ডের পর ঘটনা তার নিজের পথ ধরেই এগিয়েছে। আপনি যদি একে সন্ত্রাসবাদ বলে ধরেন, তা হলে নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘটনা ছাড়া এর সঙ্গে ক্ষীণতম ভাবেও তুলনীয় কোন ঘটনা পাবেন না। বিশ্ব-আদালত এ ঘটনাকে প্রায় আগ্রাসন বলে চিহ্নিত করেছে। এ ক্ষেত্রে সব সময়েই প্রথমে একটা আদর্শগত আক্রমণ শানানো হয়, যার থেকে এক কাল্পনিক দৈত্য তৈরি হয়, তারপর তাকে চূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রচার চলে। যদি তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা থাকে, তা হলে আর আপনি এগোবেন না। সে বড় বিপজ্জনক। কিন্তু যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে তাকে মেরে একেবারে গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে, তা হলে অবশ্য আমরা তা করতে পারি এবং আরও একবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি।

নির্বাচিত পরিপ্রেক্ষিত

কিছু দিন ধরেই এ জিনিশ চলছে। ১৯৮৬-র মে মাসে আর্মান্দো ভাল্লাদারেস কিউবার বন্দিশালা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর প্রকাশিত হয় তাঁর স্মৃতিকথা। সঙ্গে-সঙ্গেই গণমাধ্যমে তা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিই। গণমাধ্যম তাঁর এই উদ্‌ঘাটনকে বর্ণনা করে এই ভাবে :'কাস্ত্রো অত্যাচার ও কারাগারের যে-ব্যাপক ব্যবস্থা দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের শাস্তি দেন ও তাদের নিশ্চিহ্ন করেন— এ হল তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ।' 'পাশবিক কারাগার', অমানবিক অত্যাচার, এবং এ শতকের আরও এক গণ-হত্যাকারীর অধীনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এ 'এক অনুপ্রাণিত ও স্মরণীয় বিবরণ',

www.pathagar.com

আর অন্তত এ বই থেকে আমরা জানতে পারি যে 'কিউবা নামে এক নরকে, যেখানে ভাল্লাদারেস থাকতেন' সেখানে ঐ গণ-হত্যাকারী এমন 'এক নব্য স্বেচ্ছাচারের জন্ম দিয়েছেন, যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিশেবে অত্যাচারকে প্রায় এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।' এ হল *ওয়াশিংটন পোস্ট* এবং *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এ এই বইয়ের পুনরাবৃত্ত পর্যালোচনা থেকে নেওয়া। কাস্ত্রো সেখানে এক 'স্বেচ্ছাচারী গুণ্ডা' হিশেবে বর্ণিত। এ বইতে তাঁর নৃশংসতা এত তর্কাতীত ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে এর পর 'নিতান্ত লঘু মাথার ও শীতল রক্তের পশ্চিমি বুদ্ধিজীবীরাই এই স্বেচ্ছাচারী শাসককে সমর্থন করবেন'— এ কথা *ওয়াশিংটন পোস্ট* -এর। মনে রাখবেন যে মাত্র একজন লোকের জীবনে যা ঘটেছে,এ হল তার বিবরণ। ধরে নেওয়া যাক যে এর সবই সত্যি কথা। যিনি বলছেন যে তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন, সেই একজনের ক্ষেত্রে ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিয়েও কোন প্রশ্ন করছি না। শুধু বলছি যে, এর পর মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে হোয়াইট হাউস-এর এক অনুষ্ঠানে কিউবার ঐ খুনে স্বেচ্ছাচারী যে-ভয় ও ধর্ষকাম জারি করেছিল, তা সহ্য করার মতো সাহসের জন্য রেগন ভাল্লাদারেসকে বেছে নেন, এবং রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিশেবে নিয়োগ করেন। সেখানে সালভাদোর আর গুয়েতেমালার সরকার, যাদের বিরুদ্ধে আনীত নৃশংসতার অভিযোগ এত ব্যাপক ছিল যে তার তুলনায় ভাল্লাদারেস-এর যন্ত্রণাও মনে হবে খুব তুচ্ছ, তাদের পক্ষ সমর্থন করে তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। এ ভাবেই তো সব চলে।

এ হচ্ছে ১৯৮৬-র মে মাসের কথা। ঘটনাটা বেশ চিত্তাকর্ষক এবং সম্মতি তৈরি বা আদায় করার বিষয়ে এর থেকে অনেক কিছু জানা যায়। ঐ মাসেই এল সালভাদোর-এর হিউম্যান রাইটস গ্রুপের অবশিষ্ট সদস্যদের ও ডিরেক্টর হারবার্ট আনাইয়া-কে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁদের ওপর অত্যাচর শুরু হয়। নেতাদের অবশ্য আগেই খুন করা হয়েছিল। এঁদের সকলকে লা এসপেরানজা বা প্রত্যাশার কারাগারে পাঠানো হয়, সেখানেও তাঁরা মানবাধিকার রক্ষার কাজ বন্ধ করেননি। পেশায় তাঁরা আইনজীবী ছিলেন। তাঁর সেখানে ক্রমাগত হলফনামা নিতে থাকেন। মোট ৪৩২ জন বন্দি ছিলেন। তার মধ্যে ৪৩০-টি স্বাক্ষরিত হলফনামায় তাঁরা শপথ নিয়ে বর্ণনা করেছেন যে কী ভাবে তাঁদের

www.pathagar.com

ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছে— বৈদ্যুতিক শক্-সহ সে নানা নৃশংস কাণ্ড। এর মধ্যে উর্দি-পরা এক উত্তর আমেরিকান মেজর-এর অত্যাচারের কথা একটু বিশদে বলা হয়েছে। এ এক আশ্চর্য রকমের বিস্তৃত ও সর্বাঙ্গীণ সাক্ষ্য, পীড়ন-কক্ষে কী হয় না-হয়, বিশদ বিবরণের দিক থেকে সম্ভবত তার এক অদ্বিতীয় দলিল। বন্দিদের শপথ-নেওয়া সাক্ষ্যের ১৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই রিপোর্ট জেল থেকে পাচার হয়ে যায়, সঙ্গে একটা ভিডিওটেপ, যেখানে তাঁদের ওপর করা অত্যাচার নিয়ে বন্দিদের সাক্ষ্য দেওয়ার ছবি ধরা আছে। রিপোর্টটা মেরিন কাউন্টি ইন্টারফেথ টাস্ক ফোর্স নামে একটা সংগঠন সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। *জাতীয় সংবাদমাধ্যম তার বিবরণ প্রকাশে অস্বীকার করে। বিভিন্ন টিভি স্টেশনও দেখাতে অস্বীকার করে।* মেরিন কাউন্টি-র স্থানীয় কাগজ *সান ফ্রান্সিসকো এক্সামিনার*-এ শুধু একটা লেখা ছাপা হয়, আমার ধারণা ও-ই শেষ। আর কেউ তা ছুঁয়েও দেখেনি। সে ছিল এমন এক সময়, যখন 'লঘু মাথা ও শীতল রক্তের অল্প কিছু পশ্চিমি বুদ্ধিজীবী'দের চেয়ে ঢের বেশি লোক হোসে নাপোলেয়ন দুয়ার্তে ও রোনাল্ড রেগন-এর স্তব গাইছিলেন। আনাইয়া-কে কেউ শ্রদ্ধা জানাতে যায়নি। মানবাধিকার দিবসে তাঁর কথা কেউ উল্লেখ করেনি। কোন প্রতিষ্ঠানে তাঁকে কেউ নিয়োগ করেনি। বন্দি-বিনিময়ের এক কর্মসূচিতে তিনি মুক্তি পান এবং তার পর খুন হয়ে যান, সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট নিরাপত্তা বাহিনীর বাহিনীর হাতে। এ নিয়ে সে ভাবে কোন খবর কোথাও বেরোয়নি। গণমাধ্যম কখনও এ প্রশ্ন তোলেনি যে, নৃশংসতার খবর প্রকাশ করার বদলে তা চেপে গেলে তিনি প্রাণে বাঁচতেন কি না।

সম্মতি তৈরির কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা কী ভাবে কাজ করে, এ ঘটনা সে ব্যাপারে কিছু প্রায়োজনীয় কথা বলে। হারবার্ট আনাইয়া কতৃক এল সালভাদর-এর ঘটনা উদ্‌ঘাটনের তুলনায় ভাল্লাদারেস-এর স্মৃতিকথাকে পর্বতের পাশে এমনকী এক দানা মটর বলেও মনে হয় না। কিন্তু আপনাকে তো আপনার কাজ করতেই হবে। আর তা-ই আমাদের পরবর্তী যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। আমার ধারণা, এ সব ঘটনা আমরা আরও অনেক শুনব, যত ক্ষণ না পরবর্তী অভিযান পুনরায় শুরু হচ্ছে।

শেষ ঘটনাটা নিয়ে আরও কয়েকটা কথা বলব। মাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সমীক্ষার কথা আগে বলেছি, তা-ই দিয়েই শুরু করি। ঐ

www.pathagar.com

সমীক্ষায় কিছু চিত্তাকর্ষক সিদ্ধান্ত আছে। সেখানে লোকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে বেআইনি দখলদারি বা গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সদর্থে হস্তক্ষেপের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কি শক্তিপ্রয়োগ করা উচিত। যুক্তরাষ্ট্রে দু-জনের মধ্যে একজন মনে করে যে আমাদের তা করা উচিত। বেআইনি দখলদারি ও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় আমাদের শক্তিপ্রয়োগ করা উচিত। যুক্তরাষ্ট্রকে যদি এই পরামর্শ অনুসরণ করতে হয়, তা হলে ঐ এল সালভাদোর থেকে শুরু করে গুয়াতেমালা, ইন্দোনেশিয়া, দামাস্কাস, তেল আভিভ, কেপটাউন, তুর্কি থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত এক দীর্ঘ তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্রে আমাদের বোমা মারতে হয়। কেননা এ সমস্ত দেশেই বেআইনি দখলদারি, আগ্রাসন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভয়াবহ সব ঘটনা ঘটে গেছে। আর এ সবের পেছনের ঘটনাগুলো যদি আপনি জানেন, তা হলে নিশ্চয়ই এ-ও জানেন যে সাদ্দাম হুসেন-এর আগ্রাসন ও নৃশংসতা এই একই শ্রেণীতে পড়ে। তা-ও এ সব চূড়ান্ত উদাহরণ নয়। তো, এই সিদ্ধান্তে আর কেউ আসে না কেন? কারণটা হল, এ সব আদৌ কেউ জানে না। একটা কার্যকর, সুষ্ঠু প্রচারব্যবস্থায় আমি যদি এ রকম বিভিন্ন উদাহরণের তালিকা পেশ করি তো কেউ বুঝতেই পারবে না যে আমি ঠিক কী নিয়ে কথা বলছি। আপনার দেখার ইচ্ছে থাকলে দেখতে পারেন যে উদাহরণগুলো একেবারে যথাযথ।

একটার কথাই ধরুন, খাঁড়ি যুদ্ধের সময়ে যা ভীষণ ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ফেব্রুয়ারিতে, বোমাবাজির একেবারে মাঝ-মধ্যিখানে লেবানন সরকার ইজরেলকে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৪২৫ সংখ্যক প্রস্তাব মেনে তখনই লেবানন থেকে নিঃশর্ত প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ করে। এই প্রস্তাবের তারিখ ছিল, মার্চ ১৯৭৮। তার পর আরও দুটি প্রস্তাবে ঐ একই কথা বলা হয়। ইজরেল অবশ্যই তা মানে না, কারণ দখলদারি বজায় রাখার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র আগাগোড়া তাদের সমর্থন করে যায়। ইতিমধ্যে দক্ষিণ লেবাননকে সন্ত্রস্ত করে তোলা হয়। বিরাট-বিরাট পীড়নকক্ষে ভয়াবহ সব ব্যাপার সেখানে চলতে থাকে। লেবাননের অন্যান্য অংশে আক্রমণ করার জন্য ঘাঁটি হিশেবে তা ব্যবহার করা হয়। ১৯৭৮-এর পর লেবানন আক্রান্ত হয়, বেইরুট শহরে বোমা পড়ে, বিশ হাজারের মতো লোককে খুন করা হয় যার প্রায় আশি

www.pathagar.com

শতাংশই ছিল সাধারণ নাগরিক, বিভিন্ন হাসপাতালে ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড চলে, সেই সঙ্গে হয় ব্যাপক লুঠপাট, ডাকাতি, ঘোর সন্ত্রাস। এর সব ভালো, কারণ যুক্তরাষ্ট্র তাতে মদত যোগায়। এ অবশ্য মাত্র একটা ঘটনা। এ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমে আপনি কিছু খুঁজে পাবেন না, কিংবা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৪২৫ সংখ্যক প্রস্তাব বা অন্য দুটোর মধ্যে যে-কোন একটা প্রস্তাব ইজরেল বা যুক্তরাষ্ট্রের মানা উচিত কি না, তা নিয়ে কোন আলোচনা দেখতে পাবেন না। বা এ-ও দেখবেন না যে তেল আভিভ-এ কেউ বোমা মারার ডাক দিয়েছে, যদিও জনসংখ্যার দুয়ের তিন অংশ যে-নীতি ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে, তদনুযায়ী সেটাই আমাদের করা উচিত। কারণ শেষ বিচারে তা বেআইনি দখলদারি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভয়াবহ ঘটনার উদাহরণ ছাড়া আর কিছু নয়। তা-ও এ মাত্র একটা ঘটনা। পূর্ব টিমর-এ ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণে অন্তত দু-লাখ লোক মারা যায়। আগের সব ঘটনা, এর তুলনায় মনে হয়, শিশু। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তা সমর্থন করে, *এখনও* যুক্তরাষ্ট্রের গুরুতর কূটনৈতিকও সামরিক সমর্থনে তারা তা চালিয়ে যাচ্ছে। তো, এ ভাবে আমরা অসংখ্য ঘটনার কথা বলে যেতে পারি।

খাঁড়ি-যুদ্ধ

একটা সুষ্ঠু প্রচারব্যবস্থা কী ভাবে কাজ করে, এ সবই আপনাকে তা জানায়। লোকে এ কথা বিশ্বাস করতে পারে যে আমরা যখন ইরাক বা কুয়েত-এর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করি, তখন তা করি এই কারণে যে বেআইনি দখলদারি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কোথাও ঘটলে বলপ্রয়োগ করেই যে তা মোকাবিলা করতে হবে, এ আমরা সত্যি বলেই মনে করি। ঐ একই নীতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে তার অর্থ কী দাঁড়াবে, তারা তা দেখতে পায় না। বলতেই হবে যে, প্রচারের এ এক চমকপ্রদ সাফল্য।

আর-একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ১৯৯০-এর অগস্টের পর থেকে যুদ্ধের খবর আপনি যদি একটু খুঁটিয়ে দেখেন তো দেখবেন সেখানে গুরুতর বেশ কিছু কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যেমন ধরুন, ইরাকে একটা গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

বিরোধী শক্তি আছে, যা খুবই সাহসী এবং বেশ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অবশ্য কাজ করতে হয় নির্বাসন থেকে, কারণ ইরাকে তাঁদের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব। মূলত তাঁরা আছেন ইয়োরোপে তাঁদের কেউ ব্যাঙ্কার, কেউ এঞ্জিনিয়ার, কেউ স্থপতি। তাঁদের গলায় স্বর আছে, তাঁরা কথা বলতে পারেন এবং তাঁরা তা বলেনও। গত ফেব্রুয়ারিতে, সাদ্দাম হুসেন যখন জর্জ বুশ-এর প্রিয় বন্ধু ও ব্যবসার অংশীদার ছিলেন, ইরাকি গণতান্ত্রিক বিরোধীদের কথানুযায়ী, ইরাকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের দাবির প্রতি খানিকটা সমর্থনের অনুরোধ নিয়ে তাঁরা ওয়াশিংটনে পর্যন্ত দৌড়ে এসেছিলেন। তাঁদের স্রেফ হঠিয়ে দেওয়া হয়, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের তাতে কোন আগ্রহ ছিল না। প্রকাশ্য নথিতে এর কোন প্রতিক্রিয়া কোথাও চোখে পড়েনি।

অগস্টের পর থেকে তাঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। বহু বছর সমর্থন করে আসার পর ঐ অগস্টেই আমরা হঠাৎ করে সাদ্দাম হুসেনের বিরোধিতা করতে শুরু করি। ইরাকের গণতান্ত্রিক বিরোধীদের এ নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলার আছে। সাদ্দাম হুসেনকে টেনে নামালে বা তাকে তুলোধোনা করলে তাঁদের খুশিই হওয়ার কথা। তাঁদের ভাইদের খুন করেছে সাদ্দাম, বোনেদের ওপর অত্যাচার করেছে এবং তাঁদের দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছে। রোনাল্ড রেগন আর জর্জ বুশ যে-সময়ে সাদ্দামকে স্রেফ লালন করে গেছেন, ঠিক সে সময়ে তাঁরা সাদ্দামের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করেছেন। তা, তাঁদের কণ্ঠস্বর কোথায়? জাতীয় গণমাধ্যমের সর্বত্র খুঁজে একবার দেখুন যে অগস্ট ১৯৯০ থেকে '৯১-এর মার্চ পর্যন্ত তাঁদের সম্পর্কে কতটুকু খবর আপনি সেখানে খুঁজে পান। একটা শব্দও পাবেন না। এমন নয় যে তাঁরা চুপ করে ছিলেন। বিবৃতি দিয়েছেন, প্রস্তাব এনেছেন, আহ্বান জানিয়েছেন ও দাবিসনদ পেশ করেছেন। সে সব যদি আপনি দেখেন তো দেখবেন যে আমেরিকার শান্তি-আন্দোলনের বিবৃতি, প্রস্তাব বা দাবির থেকে তার খুব কিছু পার্থক্য নেই। তাঁরা সাদ্দামের বিরোধী এবং ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরও বিরোধী। তাঁরা চান না যে তাঁদের দেশ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাক। তাঁরা এই বিরোধের একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান চান এবং এ-ও ভালো করে জানেন যে সেটা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু এ ধারণা ভুল, ফলে তারা বাদ, একেবারে বরবাদ। ইরাকি গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

বিরোধীদের সম্পর্কে তাই একটি কথাও আমরা কোথাও শুনতে পাই না। তাঁদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে আপনাকে জার্মান, নয়তো ব্রিটিশ সংবাদ-মাধ্যমের শরণ নিতে হবে। ওরা যে তাঁদের সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলে তা নয়, তবে আমাদের চেয়ে ওদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কম বলে তা-ও সামান্য কিছু অন্তত সেখানে মেলে।

প্রচারের এ এক চমকপ্রদ সাফল্য। প্রথমত, ইরাকি গণতন্ত্রীদের কণ্ঠস্বরকে সম্পূর্ণ বরবাদ করে দেওয়া গেছে। এবং দ্বিতীয়ত, কেউ তা লক্ষ পর্যন্ত করেনি। এ-ও কম আগ্রহের ব্যাপার নয়। ইরাকি গণতান্ত্রিক বিরোধীদের স্বর যে আমরা শুনতে পাচ্ছি না, আদপেই তা লক্ষ না-করার জন্য এবং তা নিয়ে প্রশ্ন না-তোলার জন্য সত্যি খুব গভীর ভাবে মতদীক্ষিত জনগণের দরকার। প্রশ্ন তুললে দেখব যে তার উত্তরটাও খুব সোজা: কারণ, ইরাকি গণতন্ত্রীদের চিন্তার ধারা তাঁদের নিজস্ব, আন্তর্জাতিক শান্তি-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁরা সহমত, ফলে প্রকাশ্য আলোচনা থেকে তাঁরা বাদ—পুরো বরবাদ।

যুদ্ধের কারণ কী, আসুন এবার তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। যুদ্ধের সব কারণই বলে দেওয়া আছে। কারণ হল : আগ্রাসককে পুরস্কৃত করা যায় না, বরং চকিত হিংসায় আগ্রাসরে মুখ উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয়। এই নাকি যুদ্ধের কারণ। অন্য আর কোন কারণ সামনে আনা হয়নি। এটা কি আদৌ যুদ্ধের কোন কারণ হতে পারে ? যুক্তরাষ্ট্র নিজে কি এই নীতি মানে যে আগ্রাসককে পুরস্কৃত করা যায় না ও চকিত হিংসায় আগ্রাসনের মুখ উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয়? ঘটনার বিবরণ দিয়ে আমি আর আপনাদের বুদ্ধিমত্তাকে অপমান করতে চাই না, কিন্তু মজা হল, পড়াশোনা-করা পুঁচকে যে-কোন ছেলেই দু-মিনিটে এ যুক্তি উড়িয়ে দিতে পারে। যদিও সে সব কোন দিনই কেউ উড়িয়ে দেয়নি। গণমাধ্যমের দিকে চেয়ে দেখুন, উদারপন্থী সব লেখক ও সমালোচক, যারা কংগ্রেসে সাক্ষ্য দেয়, তারাই লক্ষ রাখে যে এ সমস্ত নীতির পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তুলছে কি না। যুক্তরাষ্ট্র কি পানামার ওপর তার নিজের আক্রমণের বিরোধিতা করেছিল এবং আক্রমণের মুখ উলটো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ওয়াশিংটনে বোমা মারার দাবি জানিয়েছিল? ১৯৬৯-এ যখন নামিবিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার দখলদারি

www.pathagar.com

বেআইনি ঘোষিত হয়, যুক্তরাষ্ট্র কি তখন খাদ্য ও ওষুধের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ? তারা কি যুদ্ধে গিয়েছিল ? কেপ টাউনে বোমা মেরেছিল? না। বদলে বিশ বছর ধরে তারা 'মৌনতার কূটনীতি' করে গেছে। এই বিশটা বছর কিন্তু খুব প্রীতিকর কিছু ছিল না। শুধু রেগন-বুশের প্রশাসনকালেই দক্ষিণ আফ্রিকা পার্শ্ববর্তী নানা দেশে অন্তত ১৫ লক্ষ লোককে খুন করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা বা নামিবিয়ায় কী হয়েছে, তা ভুলে যান। কোন কারণেই আমাদের আত্মাকে তা দগ্ধ করে না। আমরা আমাদের 'মৌনতার কূটনীতি' চালিয়ে গেছি এবং অগ্রাসকদের প্রভূত পুরস্কার দিয়ে আমাদের দায়িত্ব শেষ করেছি। নামিবিয়ায় আমরা তাদের একটা প্রধান বন্দর ছেড়ে দিয়েছি এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের ব্যাপক সুবিধে করে দিয়েছি। কোথায় গেল সে সব নীতি? যুদ্ধে যাওয়ার ও-সব যে কোন কারণ নয়, তা দেখানো আবারও ঐ ছেলেখেলা হবে, কারণ আমরা এ সব নীতি নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না। কিন্তু ঐ ছেলেখেলাটুকু পর্যন্ত কেউ করেনি, আর এ ক্ষেত্রে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকে সহজেই যে-কথাটা বলা যায়, চোখে আঙুল দিয়ে কেউ তা দোবানোরও চেষ্টা করেনি। কথাটা এই যে, যুদ্ধে যাওয়ার কোন কারণ দেখানো হয়নি। একটা কারণও না। এমন একটাও কারণ দেখানো হয়নি, যা পুঁচকে একটা ছেলে দু-মিনিটেই উড়িয়ে দিতে পারবে না। এ হল আবারও ঐ আগ-মার্কা একচ্ছত্র সংস্কৃতির চিহ্ন। এ সব জেনে আমাদের আতঙ্কিত হওয়া উচিত যে আমরা এতটাই গভীর ভাবে একচ্ছত্র রাষ্ট্রচিন্তার অনুগামী যে কোন রকম কারণ না-দেখিয়েই আমাদের যুদ্ধে খেদানো যায়। লেবাননের অনুরোধের কথাটা বিবেচনা করা তো দূরের কথা, কেউ তা খেয়াল পর্যন্ত করে না। এ খুব লক্ষণীয় ঘটনা।

বোমাবাজি শুরুর ঠিক আগে, মধ্য-জানুয়ারিতে, *ওয়াশিংটন পোস্ট* ও এবিসি-র এক গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষায় কিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য জানা যায়। লোকজনের কাছে জানতে চাওয়া হয়, নিরাপত্তা পরিষদ আরব ও ইজরেলের সংঘর্ষের সমস্যাটা বিবেচনা করে দেখবে, এই আশ্বাসের ভিত্তিতে ইরাক যদি কুয়েত থেকে সরে যেতে রাজি হয়, তা হলে তারা কি তার পক্ষে ? প্রতি দু-জনের মধ্যে একজন জানায় যে তারা এর পক্ষে। ইরাকি গণতন্ত্রীরা সমেত গোটা দুনিয়াই এর পক্ষে। ফলে এই সমীক্ষার প্রতিবেদনে বলা হয় যে, দুই-

www.pathagar.com

তৃতীয়াংশ আমেরিকান এই সমঝোতা-সূত্রের পক্ষে। এখন, ঘটনাচক্রে যারা এই চিন্তার পক্ষে, সম্ভবত তারা দুনিয়ায় একা, কারণ কোন সংবাদ-পত্রে তার পর কেউ বলেনি যে, বাঃ, এ তো খুব ভালো কথা। ওয়াশিংটনের নির্দেশ ছিল, আমরা এই 'সংযুক্তি'র বিরোধী, অর্থাৎ এই কূটনীতির বিরোধী, ফলে প্রত্যেকে নির্দেশমতো কুচকাওয়াজ করে চলেছে এবং প্রত্যেকেই কূটনীতির বিরোধী। খবরের কাগজে এ নিয়ে কোন লেখা খুঁজে বার করার চেষ্টা করুন—*লস এঞ্জেলস টাইমস*-এ আলেক্স ককবার্ন-এর একটা লেখা পাবেন, যেখানে তিনি বলেছেন এ একটা ভালো প্রস্তাব। ঐ প্রশ্নের যারা উত্তর দিয়েছিলেন, এর পর তো ভাবতে বাধ্য যে, ও, আমি তা হলে একা, কিন্তু কী জানি, আমি তো এ ভাবেই ভাবি। এখন ধরুন, তারা জনালেন যে তারা মোটেই একা নন, ইরাকি গণতন্ত্রীদের মতো আরও অনেকে এ রকম ভাবে। ধরুন, তারা জানলেন যে এ প্রশ্ন আদৌ কল্পিত নয়, সত্যিই ইরাক ঠিক এ রকম একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ সরকারি সব লোক ঠিক আট দিন আগে এ কথা জানিয়েছেন। ২ জানুয়ারি সরকারি লোকেরা এক ইরাকি প্রস্তাব প্রকাশ করেছেন, যাতে ইরাক রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আরব ও ইজরেলের সংঘর্ষ এবং গণ-বিধ্বংসী অস্ত্রের সমস্যা নিয়ে বিবেচনার আশ্বাসে কুয়েত থেকে পুরো সরে আসার কথা বলেছে। কুয়েত আক্রমণের বহু আগে থেকে যুক্তরাষ্ট্র এ নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আসছে। ধরুন, লোকে জানল যে প্রস্তাবটা সত্যি আলোচনার টেবিলে আছে এবং তা ব্যাপক ভাবে সমর্থিত। শান্তিপ্রিয় যে-কোন যুক্তিবাদী লোক এ ক্ষেত্রে এ ছাড়া আর কিছু চাইবেন না, অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা এ-ই চাইব, একমাত্র অস্বাভাবিক কোন ক্ষেত্রেই আমরা আগ্রাসনের মুখ উলটো দিকে ঘুরিয়ে ধরার কথা ভাবতে পারি। ধরা যাক, এ সমস্তই জানা ছিল। তা হলে কী হত? এ ক্ষেত্রে আপনার মতো করে আপনি অনুমান করে নিতে পারেন, কিন্তু আমার ধারণা এ প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন সে ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ থেকে অন্তত ৯৮ শতাংশে পৌঁছত। এই হল প্রচারের সাফল্য। এ সমীক্ষায় যারা প্রশ্ন-মোতাবেক উত্তর দিয়েছেন সম্ভবত তাদের এক জনও এ সবের কিছুই জানতেন না। লোকে ভেবেছে এ বাবদে তারা একা। আর সে কারণেই কোন রকম বিরোধিতাহীন যুদ্ধের নীতিতে স্বচ্ছন্দে এগোনো গেছে।

www.pathagar.com

নিষেধাজ্ঞায় কোন কাজ হবে কি না, এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এমনকী সিআইএ-র প্রধানও এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞায় ইতিমধ্যেই কোন কাজ হয়েছে কিনা—অকাট্য এই প্রশ্ন নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। উত্তর হল, হ্যাঁ, আপাতত এতে কাজ হয়েছে, হয়তো অগস্টের শেষে, খুব সম্ভব ডিসেম্বরের শেষেও এই সূত্রে কিছু কাজ হয়েছে। এখন, ইরাকি প্রস্তাবের পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য ভেবে বার করা খুবই কঠিন। উচ্চপদস্থ মার্কিন আধিকারিকরাই তো তা প্রামাণ্য বলে রায় দিয়েছেন, তাকে 'আলোচনার যোগ্য' 'গুরুতর বিষয়' বলে বর্ণনা করেছেন, তার কিছু-কিছু তারাই প্রকাশ করেছেন। তা হলে মূল প্রশ্নটা হল : নিষেধাজ্ঞায় কি ইতিমধ্যে কাজ হয়েছে? সমস্যার সমাধানে অন্য আর কোন পথ কি খোলা ছিল? এমন কোন পথ কি ছিল যা সাধারণ লোক, এই দুনিয়া এবং ইরাকি গণতন্ত্রীদের কাছে গ্রহণীয়? এ সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি আর এ সব যাতে আলোচিত *না*-হয়, কোন সুষ্ঠু প্রচারব্যবস্থায় সেটা দেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় কমিটির অধ্যক্ষ এ কারণেই এ কথা বলতে পারেন যে, কোন ডেমক্র্যাট ক্ষমতায় থাকলে কুয়েত আজও মুক্ত হত না। তিনি দিব্যি এ কথা বলতে পারলেন, আর কোন ডেমক্র্যাটই উঠে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারল না যে, আমি যদি রাষ্ট্রপতি হতাম তা হলে আজ নয়, ছ-মাস আগেই কুয়েত মুক্ত হত, কারণ তখন তার সুযোগ ছিল ও আমি তার সদ্ব্যবহার করতাম, তার জন্য লক্ষ-লক্ষ লোককে আমায় খুন করতে হত না, প্রকৃতি-পরিবেশেও এই বিপর্যয় ঘটাতে হত না। কোন ডেমক্র্যাট এ কথা বলতে পারেননি, কারণ কোন ডেমক্র্যাট এ অবস্থান নেননি। হেনরি গঞ্জালেস এবং বার্বারা বক্সার নিয়েছিলেন। কিন্তু এ অবস্থানে যারা সত্যিই পৌঁছেছিলেন, তাদের সংখ্যা এত কম ছিল যে তাকে প্রায় অস্তিত্বহীনই বলা চলে। কোন ডেমক্র্যাট এ কথা বলার জায়গায় ছিলেন না বলেই ক্লেটন ইউটার এ বিবৃতি দিতে দ্বিধা করেননি।

এ দিকে, ইজরেলে যখন স্কাড মিসাইল আছড়ে পড়ে, সংবাদ-মাধ্যমে কেউ তখন হাততালি দেয়নি। সুষ্ঠু প্রচারব্যবস্থার এ-ও এক আকর্ষণের দিক। হয়তো আমরা জানতে চাইব, হ্যাঁ, কেন দেয়নি? সাদ্দাম হুসেন-এর যুক্তিও ছিল ঠিক জর্জ বুশ-এর মতো। কী ছিল সে সব? লেবাননের কথাই ধরা যাক।

www.pathagar.com

সাদ্দাম বলেছিলেন, সংযুক্তি তিনি একদম সহ্য করতে পারেন না। নিরাপত্তা পরিষদের সর্বসম্মত চুক্তির বিরুদ্ধে হলেও ইজরেলের সঙ্গে সিরিয়ান গোলান হাইটস ও পূর্ব জেরুসালেমকে তিনি সংযুক্ত হতে দিতে পারেন না। সংযুক্তি তিনি সহ্য করতে পারেন না। আগ্রাসনও তাঁর সহ্য হয় না। ১৯৭৮ থেকে ইজরেল নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে, তদনুযায়ী চলতে অস্বীকার করে দক্ষিণ লেবানন দখল করে বসে আছে। এ সময়ে লেবাননের সর্বত্র তারা আক্রমণ করে গেছে, ইচ্ছে মতো এখনও তারা লেবাননে বোমা মারে। এ তিনি সহ্য করতে পারেন না। পশ্চিম তটে ইজরেলি নৃশংসতার যে-প্রতিবেদন অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশ করেছে, তা তিনি পড়ে থাকতে পারেন। তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। এ তিনি সহ্য করতে পারেন না। নিষেধাজ্ঞা কাজ করে না, কারণ যুক্তরাষ্ট্র তাতে ভেটো দেয়। আলোচনায় কাজ হয় না, কারণ যুক্তরাষ্ট্র সে পথ রুদ্ধ করে রাখে। ফলে বলপ্রয়োগ ছাড়া আর বাকি থাকে কী? তিনি বহু দেখেছেন লেবাননের ক্ষেত্রে তেরো বছর, পশ্চিম তটের ক্ষেত্রে দেখছেন কুড়ি বছর। এ সব যুক্তি আপনারা আগেও শুনেছেন। কিন্তু আগের সঙ্গে এখনকার পার্থক্য হল, এখন সাদ্দাম হুসেন সত্যিই বলতে পারে যে নিষেধাজ্ঞা ও আলোচনায় কোন কাজ হয় না, কারণ যুক্তরাষ্ট্র তা হতে দেয় না। কিন্তু জর্জ বুশ তো আর এ কথা বলতে পারেন না, কারণ আপাত ভাবে হলেও নিষেধাজ্ঞায় কাজ হয়েছিল, পাশাপাশি এ কথায় আস্থা রাখারও কারণ আছে যে আলোচনাতেও কাজ হয়—হয় না শুধু তখনই, যখন তিনি গোঁয়ারের মতো সে পথে হাঁটতে অস্বীকার করেন, স্পষ্ট করে বলেন যে, না, এখন কোন আলোচনা হবে না। খবরকাগজে কাউকে কখনও দেখেছেন এ কথা বলতে? দেখেননি, কারণ এ খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। এমন একটা বিষয় যে পড়ালেখা করা পুঁচকে একটা ছেলেরও তা বুঝতে এক মিনিটের বেশি লাগে না। কিন্তু কেউ এ কথা বলেনি, কোন প্রতিবেদক বা সম্পাদকীয় লেখক এর উল্লেখ করেনি। আবারও, এ হল খুব কার্যকর একচ্ছত্র ব্যবস্থাধীন সংস্কৃতির লক্ষণ। এর থেকে এ-ও বোঝা যায় যে সম্মতি তৈরি বা আদায়ের পদ্ধতিও দিব্যি কাজ করছে।

এ ব্যাপারে আপাতত শেষ কিছু কথা। উদাহরণ আমরা অনেক দিতে পারি, এগানোর পথে আপনি নিজেও কিছু সংগ্রহ করে নিতে পারেন। ঐ কথাটাই ধরুন যে সাদ্দাম হুসেন এক মস্ত দৈত্য, গোটা দুনিয়াকে যে পদানত

www.pathagar.com

করতে উদ্যত—যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক লোক তা বিশ্বাস করেছিল, হয়তো তাতে বাস্তবতাও কিছু ছিল। তো, কথাটা লোকের মাথায় একেবারে গজাল মেরে-মেরে ঢোকানো হল। কী? না, সব কিছু সে কেড়ে নিতে চায়। এক্ষুনি তাকে থামানো দরকার। তা, এত ক্ষমতাধর সে হয়ে উঠল কী করে? কোন কলকারখানার ব্যাপার নেই, ছোট্ট একটা তৃতীয় বিশ্বের দেশ তার। আট বছর ধরে সে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আর তা-ও বিপ্লবোত্তর ইরান, তার সামরিক শক্তি ও সেনানেতৃত্বের অনেকটাই যে নষ্ট করে ফেলেছে। ঐ যুদ্ধে ইরাকের পক্ষে কিছু সমর্থনও জোটে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, ইয়োরোপ, গুরুত্বপূর্ণ সব আরব দেশ এবং আরব তৈল উৎপাদকরা সব তাকে মদত দেয়। তবু সে ইরানকে হারাতে পারেনি। তার পর কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ করে সে গোটা দুনিয়া জয় করার জায়গায় চলে গেল? তা, এ প্রশ্ন কি কাউকে করতে শুনেছেন? ঘটনা হল, দেশটা তৃতীয় বিশ্বের, তার সেনাবাহিনী তৈরি হয়েছে কৃষকদের নিয়ে। এখন এ কথাও স্বীকার করা হচ্ছে যে আত্মরক্ষার্থে দুর্গ, রাসায়নিক অস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে এত কাল অজস্র মিথ্যে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ কথা বলার মতো কাউকে খুঁজে পেয়েছেন কি? না, পাননি। আর সেটা খুব স্বাভাবিক। ম্যানুয়েল নোরিয়েগা-র সঙ্গেও ঠিক একই ব্যবহার করা হয়েছিল, আর লক্ষ করুন ঠিক তার এক বছর পরে এটা করা হল। বুশ-এর বন্ধু সাদ্দাম হুসেন বা বেইজিং-এ তাঁর অন্যান্য বন্ধু কিংবা স্বয়ং জর্জ বুশ-এর তুলনায় নোরিয়েগা খুবই ছোটখাটো খুনে। খারাপ লোক, কিন্তু ঠিক বিশ্বমানের নয়, আমরা যেমন পছন্দ করি, ঠিক তেমন নয়। কিন্তু প্রমাণ মাপের চেয়ে ঢের বড় করে তাকে দেখানো হল। মাদকদ্রব্য পাচারকারীদের নেতৃত্ব দিয়ে সে নাকি আমাদের ধ্বংস করতে আসছে। ফলে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আমাদের তাকে গুঁড়িয়ে দিতে হল, কয়েকশো কিংবা কয়েক হাজার লোককে এ জন্য খুন করতে হল, আর মাত্র আট শতাংশ শ্বেতাঙ্গের শাসন কায়েম করতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটা স্তরে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অফিসারদের বসাতে হল। এ সব কাজই আমাদের করতে হল, কারণ শেষ পর্যন্ত আমাদের তো আত্মরক্ষা করতেই হত, নইলে ঐ দৈত্য আমাদের ধ্বংস করে দিত। এক বছর পর সাদ্দাম হুসেনও ঐ একই কাজ করল। এ কথা কেউ বলেছে? কী ঘটল এবং কেন— সে কথা জানতে চেয়েছে?

www.pathagar.com

লক্ষ করে দেখুন ক্রিল কমিশনের সঙ্গে এর আদৌ কোন তফাত নেই, যারা শান্তিবাদী জনতাকে ক্ষেপিয়ে উন্মত্ত যুদ্ধবাজে পরিণত করেছিল, জনতা যখন নিজেদের বাঁচাতে যা-কিছু জার্মান সব ধ্বংস করেতে চাইছে। পদ্ধতি ও কৌশল হয়তো ইতিমধ্যে অনেক আধুনিক হয়েছে, টিভি এসেছে, বিস্তর টাকা ঢুকেছে, কিন্তু এ সবই খুব পুরনো ও প্রথাগত।

মূল বক্তব্যে ফিরে আসি, আমার মনে হয় না বিষয়টা নেহাতই মিথ্যে তথ্য, তথ্যহীনতা বা খাঁড়ি সংকটেই সীমাবদ্ধ। বিষয়টা তার চেয়ে ঢের ব্যাপক। সেটা হল, আমরা কি কোন মুক্ত সমাজে বাস করতে চাই, না কি চাই এক ধরনের স্ব-আরোপিত একচ্ছত্র শাসনের বশীভূত হয়ে থাকতে, যেখানে বিহ্বল পশুদলের অবস্থান সমাজের প্রান্তে, তাদের লক্ষ্য বিপথে চালিত, আতঙ্কিত তারা, জাতীয়তাবাদী শ্লোগানে উচ্চকিত, প্রাণভয়ে ভীত, গভীর সম্ভ্রমে তাদের নেতার প্রতি অবনত, যে নাকি ধ্বংসের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবে। আর ওদিকে শিক্ষিত লোকেরা সেখানে নির্দেশমতো কুচকাওয়াজে ব্যস্ত, যে-সমস্ত শ্লোগান তাদের বারংবার আবৃত্তি করার কথা তার উচ্চারণে অকুণ্ঠ। আর এ ভাবে সমাজ-সংসারের হাল সেখানে যা দাঁড়াবে, তা কহতব্য নয়। শেষ পর্যন্ত তা হলে বলপ্রয়োগকারী এক ভাড়াটে রাষ্ট্রে আমরা পরিণত হব এবং আশা করব যে অন্যেরা গোটা দুনিয়াকে ধ্বংস করার জন্য তখন আমাদের নজরানা দেবে। তা হলে আপাতত পছন্দ করার মতো এই সমস্ত বিকল্পের মুখোমুখি আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অনেকটাই নির্ভর করছে *আমার-আপনার* মতো সাধারণ লোকের ওপর।

(মিডিয়া কন্ট্রোল : দ্য স্পেকটাকুলার অ্যাচিভমেন্ট অফ প্রোপাগান্ডা, ওপেন মিডিয়া প্যামফ্লেট সিরিজ-এর বই, সেভেন স্টোরিজ প্রেস, ২০০২)।

উল্লেখ থাক যে এই লেখায় প্রকাশিত লেখকের মতামতের সঙ্গে অনুবাদক ও প্রকাশক সর্বত্র একমত নয়।

www.pathagar.com

মঙ্গলগ্রহের সাংবাদিক

'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে'র প্রতিবেদন কী ভাবে লেখা উচিত

এ ধরনের সভায় আলোচনার উপযুক্ত বিষয়, আমার মনে হয়, খুব স্পষ্ট : স্বভাবতই প্রশ্নটা হল, গত কয়েক মাস, বিশেষ করে ইসলামি দুনিয়ায় তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নানা সংবাদ নিয়ে গণমাধ্যম কী ভাবে নাড়াচাড়া করেছে। প্রসঙ্গত, 'গণ মাধ্যম' বলতে আমি চাই যে শব্দটাকে যথেষ্ট ব্যাপক অর্থেই বোঝা হোক। যে-সব পত্র-পত্রিকায় ভাষ্য, বিশ্লেষণ বা মতামত প্রকাশিত হয়, তা-ও এর মধ্যে পড়ে। আসলে, এ ক্ষেত্রে আমি সাধারণ ভাবে বুদ্ধিবাদী সংস্কৃতির কথাই বলতে চাইছি।

বিষয়টা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। আরও অনেকের মতো FAIR-ও এ নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করে। বক্তৃতার পক্ষে অবশ্য বিষয়টা তত জুতসই নয়, কারণ এ জন্য রীতিমতো সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এ নিয়ে আমি একটু অন্য ভাবে আলোচনায় আগ্রহী। নির্দেশিকা হিশেবে গৃহীত সাধারণ যে-সব নীতি, যেমন নিরপেক্ষতা, যাথার্থ্য, প্রাসঙ্গিকতাল ইত্যাদি, সে সবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমি বরং প্রতিবেদন কী ভাবে লেখা উচিত, সে নিয়ে কিছু প্রশ্ন করায় উৎসাহী।

www.pathagar.com

চিন্তার এক রকম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিষয়টার দিকে এগোনো যাক। মঙ্গলগ্রহের বুদ্ধিমান কোন লোকের কথা ভাবুন। সাধারণত মনে করা হয় যে মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দারা সবাই পুরুষ, সুতরাং আমি সে ভাবেই তার উল্লেখ করব। ধরা যাক যে, মঙ্গলের এই বাসিন্দা হারভার্ড ও কলাম্বিয়ার সাংবাদিকতা বিভাগে গিয়ে বড়-বড় সব কথা শিখে ফেলল, এমনকী তার সব বিশ্বাসও করল। তো, সে এ জাতীয় কোন খবর লিখবে কী ভাবে?

আমার মনে হয়, মঙ্গলগ্রহের কাগজে সে যা খবর পাঠাবে, তার শুরু হবে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে। প্রথম তথ্যটা হল এই যে, সন্ত্রাস-বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মোটেই ১১ সেপ্টেম্বর ঘোষিত হয়নি, বরং এ হল একই অলঙ্কার ব্যবহার করে বিশ বছর আগের প্রথম ঘোষণার পুনর্ঘোষিত রূপ। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিদেশনীতির মূল হবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—আমি নিশ্চিত যে আপনারা জানেন, রেগন-প্রশাসন এই ঘোষণা করে ক্ষমতায় এসেছিল। এবং সেখানে, রাষ্ট্রপতি যাকে 'সন্ত্রাসবাদের অভিশাপ' বলে অভিহিত করেছিলেন, তার নিন্দা করা হয়েছিল। তার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামি দুনিয়ায় রাষ্ট্র-সমর্থিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, এবং তৎকালীন মধ্য আমেরিকা। 'আধুনিক যুগে বর্বরতায় প্রত্যাবর্তন' করার মানসে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে সেখানে 'সভ্যতার অধঃপাতী বিরোধীদের' ছড়িয়ে-দেওয়া আপদ হিশেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। আসলে, প্রশাসনের মধ্যপন্থী স্বরাষ্ট্র সচিব জর্জ শুলৎস-এর কথাই উদ্ধৃত করছি আমি।

রেগন-এর যে-বচন একটু আগেই উদ্ধার করেছি, তার লক্ষ্য ছিল মধ্য প্রাচ্য। সাল ছিল ১৯৮৫। ঐ বছরই অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর বার্ষিক সমীক্ষায় ঐ অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে মুখ্য সংবাদ হিশেবে সম্পাদকরা বেছে নিয়েছিলেন। তো, আমাদের মঙ্গলবাসী তার প্রথম প্রতিবেদনে লিখতে পারে যে, ২০০১ সালে বিষয়টা দ্বিতীয় বারের জন্য মুখ্য সংবাদ হল। এবং আগের মতোই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এ বার পুনর্ঘোষিত হল।

আর-এক লক্ষণীয় ধারাবাহিকতা এই যে, নেতৃত্বে রয়েছে সেই একই লোকেরা। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বিতীয় দফায় ডোনাল্ড রামসফেল্ড এর

www.pathagar.com

সামরিক দিকটা দেখছেন। এ যুদ্ধের প্রথম দফায় তিনিই ছিলেন মধ্য প্রাচ্যে রেগন-এর বিশেষ দূত, এমনকী ঐ তুঙ্গ-সময়, ১৯৮৫-তেও। মাত্র এই কয়েক মাস আগে যুদ্ধের কূটনৈতিক দিকটা দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে যাঁকে রাষ্ট্রসংঘে নিয়োগ করা হল, তাঁর নাম জন নিগ্রোপন্টি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম দফায় হন্ডুরাস ছিল যুক্তরাষ্ট্রের মূল ঘাঁটি। সে বার তিনি হন্ডুরাসে মার্কিন কাজকর্মের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

ক্ষমতার প্রয়োগ

১৯৮৫ সালে মধ্য প্রাচ্যের সন্ত্রাসবাদই ছিল মুখ্য সংবাদ। আর মধ্য আমেরিকার সন্ত্রাসবাদ ছিল দ্বিতীয় সারির খবর। বস্তুত শুলৎস যাকে আপদ বলে অভিহিত করেছেন, মধ্য আমেরিকায় তার বাহ্যিক প্রকাশকে তিনি সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন। প্রধান সমস্যা, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, 'আমাদের গোলার্ধের ঠিক মাঝখানে ঘটেছে এই ক্যান্সারের প্রকোপ।' আমরা একে কেটে বাদ দিতে চাই এবং তা করতে চাই দ্রুত, কারণ এ রোগ প্রকাশ্যে হিটলারের *মাইন কামফ*-এর লক্ষ্যকে প্রচার করছে, আর এ দুনিয়ায় দখলদারি কায়েম করতে চলেছে। এ সত্যিই বিপজ্জনক। এ বিপদ এতই ভয়ঙ্কর যে ১৯৮৫ সালের আইন দিবসে রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করে বসলেন। কারণ, তাঁর কথায়, এ রোগ 'যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও বিদেশনীতির পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক এক আতঙ্কে'র পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। (প্রসঙ্গত, বিশ্বের বাদবাকি অংশে মার্কিন শ্রমিকদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি দিবস হিশেবে যে-দিনটি পালিত হয়, তারই নাম আইন দিবস। যুক্তরাষ্ট্রে এ এক উগ্র স্বাদেশিকতায় মত্ত ছুটির দিন। দিনটা হচ্ছে পয়লা মে।)

শেষ পর্যন্ত এ রোগের মূল উপড়ে না-ফেলা পর্যন্ত এই জরুরি অবস্থা প্রতি বছর নতুন করে জারি থাকে। স্বারাষ্ট্র সচিব শুলৎস ব্যখ্যা করে বলেছেন যে এ বিপদ এত ভয়ঙ্কর যে আপনি এ ক্ষেত্রে মৃদু কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁর কথায়, 'ক্ষমতার ছায়া আলোচনার টেবিলে না-পড়লে,

www.pathagar.com

সে আলোচনা আত্মসমর্পণের মোলায়েম ভাষ্য মাত্র।' যাঁরা 'এই সমীকরণে ক্ষমতার উপাদানকে অবজ্ঞা করে বাইরের মধ্যস্থতা, রাষ্ট্রসংঘ বা বিশ্ব-আদালতের মতো কাল্পনিক সব আইনগত পদ্ধতির কথা বলেন,' তিনি তাঁদের নিন্দা করেছেন।

বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্র জন নিগ্রোপন্টি-র তত্ত্বাবধানে হন্ডুরাসে ঘাঁটি করে ভাড়াটে বাহিনী দিয়ে এই সমীকরণে ক্ষমতার উপাদান প্রয়োগ করছিল। পাশাপাশি তারা সাফল্যের সঙ্গে বিশ্ব-আদালতের মাধ্যমে কাল্পনিক সব আইনগত পদ্ধতির প্রয়োগ, লাতিন আমেরিকার নানা দেশ আর বিশ্বজয়ে উদ্যত মারণরোগকে আটকাচ্ছিল।

গণমাধ্যম এর সঙ্গে একমত ছিল। প্রশ্ন উঠেছিল শুধু কৌশল নিয়ে। বাজ আর কপোতের সেই পুরনো বিতর্ক। বাজের ভূমিকা যে কী, *দ্য নিউ রিপাবলিক*-এর সম্পাদকদের কথাতেই তা স্পষ্ট বোঝা যায় (৪ এপ্রিল, ১৯৮৪)। তাঁরা, তাঁদের ভাষাতেই 'লাতিন ঘরানার ফ্যাসিস্টদের' সামরিক সাহায্যদান অব্যাহত রাখার দাবি জানান, 'কত জন তাতে খুন হল তাতে বয়ে গেল।' কারণ 'সালভাদরের লোকেদের মানবাধিকারের চেয়ে মার্কিন অগ্রাধিকার অনেক বড়।' ঐ অঞ্চলের যে-কোন জায়গার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি। তো, এই হল শিকারি বাজের চরিত্র।

অন্য দিকে কপোতের যুক্তি হল, এ পদ্ধতি মোটেই কাজ করবে না। তার চেয়ে ফিরে চলো নিকারাগুয়ার বিকল্প পদ্ধতিতে, ঐ মারণরোগে, 'মধ্য আমেরিকার ধরনে,' আর তার ওপর চাপিয়ে দাও 'আঞ্চলিক মান'। *ওয়াশিংটন পোস্ট* (১৪ ও ১৯ মার্চ ১৯৮৬) থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি আমি। মধ্য আমেরিকার ধরন আর আঞ্চলিক মান মানে এল সালভাদর বা গুয়াতেমালার মতো আতঙ্কের দেশ। সে সময়ে ঐ সব দেশে গণহত্যা, অত্যাচার ও ধ্বংসের কাজে যে-সব পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছিল, আমি আর তার বর্ণনা দিতে চাই না। তো, কপোতের কথায়, আমাদের নিকারাগুয়ায়, মধ্য আমেরিকার ধরনে ফিরে যাওয়াটাই ঠিক।

বাজ আর কপোতের পক্ষে এ ভাবেই জাতীয় সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় আর বিশেষ প্রবন্ধ প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চাশে ভাগ হয়ে যায়। ব্যতিক্রম

www.pathagar.com

ছিল, কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই সে প্রায় সংখ্যাতাত্ত্বিক ত্রুটি ছাড়া আর কিছু নয়। দেখতে চাইলে এ নিয়ে মুদ্রিত অনেক কিছুই পাবেন, আর সেটা অনেক আগের থেকেই পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ আর যে-অঞ্চলে সে সময়ে এই রোগ ফুঁসে উঠছিল, তার নাম মধ্য প্রাচ্য, যেখানে এই অভিন্নতা আরও চরম।

একই যুদ্ধ, লক্ষ্য ভিন্ন

তা, বুদ্ধিমান ঐ মঙ্গলবাসী নিশ্চয়ই সাম্প্রতিক ইতিহাসের এ সমস্ত ঘটনা, বিশেষ করে যে-সবের ধারাবহিকতা খুবই লক্ষণীয়, তার প্রতি ভালোরকম মনোযোগ দেবে, যাতে মঙ্গলগ্রহের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় এ খবর বেরোতে পারে যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তথাকথিত এই যুদ্ধ প্রায় একই রকম লক্ষ্যের বিরুদ্ধে পুনরায় ঘোষণা করেছে সেই একই লোক। যদিও, এ কথা সে হয়তো উল্লেখ করতে ভুলবে না যে লক্ষ্যটার রকম এক হলেও তা পুরোপুরি এক নয়।

২০০১-এ যারা সভ্যতার অধঃপাতী বিরোধী, ১৯৮০-তে ঠিক তারাই ছিল সিআইএ আর তার সহযোগীদের উদ্যোগে সংগঠিত ও তাদেরই অস্ত্রে সমৃদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামীর দল। সেই একই বাহিনী তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিল, আজ যারা আফগানিস্তানের গুহায় তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রথম দফার যুদ্ধে তারা অংশ নিয়েছিল, এবং এ যুদ্ধে আজ যারা যুক্ত তাদের মতো তারাও প্রায় একই ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রথম থেকেই তারা তাদের সন্ত্রাসবাদী কর্মসূচি গোপন করেনি, প্রকৃতপক্ষে যার শুরু সেই ১৯৮১-তে, যখন ইজিপ্টের রাষ্ট্রপতিকে তারা খুন করে। এখনও তা শেষ হয়নি। এর মধ্যে রাশিয়ার ভেতর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনাটাও আছে, যার প্রচণ্ডতায় পাকিস্তানের সঙ্গে প্রায় যুদ্ধ লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যদিও ১৯৮৯-তে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে বিধ্বস্ত দেশকে তুলে দিয়ে আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া পশ্চাদপসরণ করলে তা বন্ধ হয়। আমেরিকানরা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সেখানে গণহত্যা, ধর্ষণ ও সন্ত্রাসের পথ ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আফগানিস্তানের ইতিহাসে যা নিকৃষ্টতম পর্ব বলে চিহ্নিত।

www.pathagar.com

কাবুলের বাইরে তারা আবার দায়িত্বে ফিরে এসেছে। আজ সকালের *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এ আছে যে (২২ জানুয়ারি, ২০০১) যুদ্ধবাজ দুটো প্রধান গোষ্ঠী এখন পরস্পরের দিকে এগোচ্ছে, যার ফলে যে-কোন সময়ে বড়-সড় একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। আশা করা যাক যে তা হবে না।

এর সমস্তই মঙ্গলগ্রহের কাগজে শীর্ষ সংবাদ, অবশ্য তার সঙ্গে এ-ও থাকছে যে নাগরিকদের কাছে এ সবের অর্থ কী। এর মধ্যে থাকবে বিপুল সংখ্যক সেই সব লোকের খবর, যারা আজও ভীষণ ভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য সরবরাহ থেকে বঞ্চিত। খাবার থাকলেও তা বণ্টন করা যাচ্ছে না স্রেফ পরিস্থিতির জন্য। হ্যাঁ, চার মাস পরেও অবস্থাটা এই।

এর ফলাফল কী, আমরা জানি না। কোন দিন জানব না। কারণ বুদ্ধিবাদী সংস্কৃতির একটা নীতি আছে। নীতিটা এই যে, শত্রুপক্ষের সব অপরাধ আমরা লেজার-রশ্মির তীব্রতা নিয়ে তদন্ত করে দেখব, কিন্তু নিজেদের অপরাধের দিকে কখনও তাকাব না। খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা। ফলে ভিয়েতনামে, সালভাদরে বা অন্যত্র কত লাশ আমরা ফেলে-ছড়িয়ে এসেছি, তার আনুমানিক একটা হিশেব ছাড়া আমরা আর কিছু দিতে পারছি না।

নৈতিক সমতুলের বিরুদ্ধতা

আমার ধারণা, এ সবই হয়তো মঙ্গলে শীর্ষ সংবাদ হবে। এ ছাড়া মঙ্গলগ্রহের ভালো কোন সাংবাদিক হয়তো মৌলিক কিছু ধারণাকে বুঝতেও চাইবেন। প্রথমেই তিনি জানতে চাইবেন, সন্ত্রাসবাদ মানে আসলে কী। এবং দ্বিতীয়ত, এর সঠিক প্রতিক্রিয়াই বা কী। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর যা-ই হোক না কেন, সঠিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে নৈতিক কিছু স্বতঃসিদ্ধের ব্যাপার জড়িয়ে আছে। স্বতঃসিদ্ধগুলো যে ঠিক কী, গ্রহান্তরের সাংবাদিক অবশ্য তা অনায়াসেই আবিষ্কার করতে পারবেন, অন্তত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে স্বঘোষিত যুদ্ধের নেতারা তা যে-ভাবে বোঝেন। কারণ তাঁরা বলেন, বার-বারই বলেন যে তাঁরা ধার্মিক খ্রিস্টান। ফলে তাঁরা যিশুর প্রচারিত বাণীকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করেন,

www.pathagar.com

অর্থাৎ তাঁরা সেখানে স্পষ্ট করে দেয়া 'ভণ্ডে'র সংজ্ঞাটাও নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন। ভণ্ড মানে যারা অন্যদের কোন বিশেষ নীতি মেনে চলতে বলে, নিজেরা তা পালন করতে অস্বীকার করে।

অর্থাৎ মঙ্গলবাসী বোঝেন যে ন্যূনতম নৈতিক স্তরে পৌঁছনোর জন্য অন্তত এ বিষয়ে আমাদের একমত হতে হবে যে, কোন কাজ যদি আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক হয় তো অন্যদের ক্ষেত্রেও তা সঠিক। অন্যেরা করলে যদি তা ভুল হয় তো আমরা করলেও ভুল। এ হল নৈতিক স্বতঃসিদ্ধের একেবারে গোড়ার কথা। আর একবার এ কথা বুঝলে মঙ্গলের সাংবাদিক সম্ভবত তাঁর বাক্স গুছিয়ে মঙ্গলে ফিরে যাবেন। কারণ তাঁর গবেষণার কাজ এতে শেষ হবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ ও ভাষ্যের মধ্যে একটা, স্রেফ একটা কথাও তিনি খুঁজে বার করতে পারবেন না, যেখানে এই ন্যূনতম স্তরটুকুকেও স্বীকার করা হয়েছে। আমার কথা মেনে নিতে হবে না, পরীক্ষাটা নিজেই করে দেখুন। বাড়িয়ে কিছু বলতে চাই না, এ রকম কথা আপনি ইতস্তত পাবেন, পাবেন প্রান্তসমায়, তা-ও খুব কম।

এ সত্ত্বেও এই নৈতিক স্বতঃসিদ্ধের কথা মূল স্রোতে স্বীকৃত। একে এক ভয়ানক বিপজ্জনক বিরুদ্ধতা বলে মনে করা হয়, ফলে এর বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা আবশ্যিক। এমনকী কেউ তা প্রকাশ করার আগেই এ কাজ করা দরকার, যদিও এর প্রকাশও খুব বিরল ব্যাপার। যাকে আমরা শ্রদ্ধা করার ভান করি, আমাদেরও সেই নৈতিক স্বতঃসিদ্ধের নিয়ম মেনে চলা উচিত, এ কথা বলার দুঃসাহস দেখিয়ে যদি কেউ কোন বিরোধিতায় যোগ দেয়, তাদের জন্য এমনকী পরিভাষায় একটা শব্দও আছে বিরোধীরা সে ক্ষেত্রে নৈতিক আপেক্ষিকতার তাত্ত্বিক অপরাধে অভিযুক্ত হবে। তার অর্থ নিজেদের প্রতি আমরা যে-মানদণ্ড প্রয়োগ করি, অন্যদের প্রতিও সেই একই মানদণ্ড আমরা ব্যবহার করি। অথবা তা হয়তো নৈতিক সমতুলতা, যে-কথাটা, আমার ধারণা, আমাদের অপরাধের দিকে লক্ষ করার দুঃসাহস দেখানোর বিপদকে দূর করার জন্য তৈরি করেছেন জান কার্কপ্যাট্রিক।

অথবা হয়তো তারা আমেরিকাকে আঘাত করার অপরাধ করে চলেছে, কিংবা তারা আমেরিকা-বিরোধী। এটা বরং একটা মজার ধারণা। অন্যত্র এই

www.pathagar.com

শব্দটা শুধু একচ্ছত্র রাষ্ট্রেই ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন পুরনো রাশিয়ায়, যেখানে সোভিয়েতের বিরোধিতাই ছিল চূড়ান্ত অপরাধ। ইতালিতে যদি কেউ একটা বই বের করে, যার নাম *দ্য অ্যান্টি-ইতালিয়ানস*, তা হলে মিলান বা রোমের রাস্তায় তার কী প্রতিক্রিয়া হবে, তা কল্পনা করা যায়। বা অন্য কোন দেশে, যেখানে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিষয়টা ঠিক তাচ্ছিল্যের ব্যাপার নয়।

অব্যবহার্য একটা সংজ্ঞা

কিন্তু ধরা যাক, মঙ্গলের ঐ সাংবাদিক অবশ্যম্ভাবী নিন্দা ও কলঙ্কে ভয় পেলেন না। ধরা যাক, সে এই প্রাথমিক নৈতিক স্বতঃসিদ্ধকে বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। বেশ, তা-ই যদি হয়, তা হলে আমি আগে যেমন বলেছি, তার বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো। কিন্তু ধরা যাক, কৌতূহলবশে সে আরও কিছু দেখার লোভে থেকে গেল। কী হবে তা হলে? আবার সেই গুরুতর প্রশ্নে ফেরা যাক যে, সন্ত্রাসবাদ কী।

এর উত্তর খোঁজার জন্য মঙ্গলের মনোযোগী ঐ সাংবাদিকের অনুসরণীয় যথাযোগ্য এক পদ্ধতি আছে : সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ যারা ঘোষণা করেছে, তাদের দিকে তাকান। সন্ত্রাসবাদ কী— দেখুন, এ বিষয়ে তারা কী বলছে। এ নিশ্চয়ই যথেষ্ট নিরপেক্ষতা। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে, সেনাবাহিনীর নির্দেশিকায় ও অন্যত্র এর একটা সরকারি সংজ্ঞাও আছে। খুবই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা। সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা হল, আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি, 'নিপীড়ন, ভীতি-প্রদর্শন বা ধীরে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে... রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা আদর্শগত লক্ষ্যে হিংসার পরিকল্পিত ব্যবহার বা হিংসার আতঙ্ক সৃষ্টি।' সোজা কথা, আর যত দূর আমি বুঝতে পারছি, সংজ্ঞাটা ঠিকও। কিন্তু এ দিকে আমরা ক্রমাগত শুনে যাচ্ছি, সন্ত্রাসবাদকে সংজ্ঞাত করার সমস্যাটা নাকি খুবই জটিল আর গোলমেলে। সে কথা যে কেন সত্যি, তা ভেবে মঙ্গলবাসী বিস্মিত হতেই পারেন। তারও একটা উত্তর আছে।

www.pathagar.com

সরকারি সংজ্ঞাটা অব্যবহার্য। কেন অব্যবহার্য, তার দুটো কারণ আছে। প্রথমত তা সরকারের গৃহীত নীতির খুবই ঘনিষ্ঠ শব্দান্তর, খুবই ঘনিষ্ঠ। সরকারি নীতি হলে তাকে বলে স্বল্প মাত্রার সংঘর্ষ বা প্রতিসন্ত্রাস।

প্রসঙ্গত, এ শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপার নয়। যত দূর আমি জানি, এ অভ্যাস বিশ্বজনীন। একটা উদাহরণ দিই। ৬০-এর দশকের মাঝে র‍্যান্ড কর্পোরেশন নামে মূলত পেন্টাগনের সঙ্গে যুক্ত এক গবেষণা সংস্থা ৩০-এর দশকে মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চিনে জাপানি আক্রমণের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিবিপ্লব বিষয়ক জাপানি নির্দেশিকার আগ্রহজনক এক সংকলন প্রকাশ করে। আমি সে সময়ে এ বিষযে বেশ আগ্রহ নিয়ে জাপানি প্রতিবিপ্লবের নির্দেশিকা আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবিপ্লব নির্দেশিকার তুলনামূলক আলোচনা করে একটা প্রবন্ধ লিখি—তুলনার কিছু নেই, কার্যত তা একই। আমার এখানে বলা উচিত যে প্রবন্ধটা কিন্তু বেশি লোক পড়েনি।

সে যা-ই হোক, এটা ঘটনা এবং আমি যত দূর জানি, এ ঘটনা বিশ্বজনীন। এ হল একটা কারণ, যে-জন্য সরকারি সংজ্ঞাটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না। অন্য কারণটা সরলতর : সন্ত্রাসবাদী কারা, এ প্রশ্নের যে-উত্তর সেখানে রয়েছে সেটা ভুল, পুরো ভুল। ফলে সরকারি সংজ্ঞাটা আপনাকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং এমন কোন উন্নত সংজ্ঞা খুঁজতে হবে, যা সঠিক উত্তর দেবে, এবং সেটা পাওয়া শক্ত। এ জন্যই আপনি শোনেন যে এ ভারি জটিল বিষয়, আর প্রাজ্ঞ লোকেরা এ নিয়ে খালি ভেবেই যাচ্ছেন, ইত্যাদি।

সৌভাগ্যবশত এরও একটা সমাধান আছে। সামাধানটা হল—ওরা আমাদের বিরুদ্ধে যে-সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে, সেটাই সন্ত্রাসবাদ। তা সে 'আমরা' যে-ই হই না কেন। আর যত দূর আমি জানি, এ ঘটনা বিশ্বজনীন, সে সাংবাদিকতাই বলুন বা জ্ঞানচর্চাই বলুন, এবং আমি মনে করি, ঐতিহাসিক ভাবেও তা বিশ্বজনীন। আমি অন্তত এমন কোন দেশ খুঁজে পাইনি, এ যারা অনুসরণ করে না। সমস্যাটার তা হলে একটা সমাধান হল। তো, সন্ত্রাসবাদের এই ব্যবহারোপযোগী বৈশিষ্ট্যায়নের ওপর ভিত্তি করে আমরা একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত টানতে পারি, আর তা-ই আপনি সর্বদা পড়ে থাকেন। যেমন আমরা আর আমাদের সহযোগীরাই সন্ত্রাসবাদের বলি এবং সন্ত্রাসবাদ

www.pathagar.com

হল দুর্বলের অস্ত্র। সরকারি অর্থে সন্ত্রাসবাদ অধিকাংশ অস্ত্রের মতো ক্ষমতাধরেরই আর-এক অস্ত্র, কিন্তু সংজ্ঞানুযায়ী এ হল দুর্বলের অস্ত্র। তা, একবার যদি আপনি বুঝতে পারেন যে আমাদের বিরুদ্ধে শুধু ওদের সন্ত্রাসই 'সন্ত্রাসবাদ,' তা হলে অবশ্য সন্ত্রাসবাদ দুর্বলের অস্ত্রে পরিণত হতে কোন বাধা থাকে না। সর্ব ক্ষণ যারা এ সব লিখে চলেছেন, আর আপনি তা কাগজে-টাগজে পড়ছেন, তার স-ব ঠিক। এ হল নিছক পুনরক্তি আর প্রথা-অনুরক্তি।

আদর্শ সন্ত্রাসবাদ

এখন ধরুন, মঙ্গলের ঐ সাংবাদিক আপাত বিশ্বজনীন এ প্রথাকে মানতে চাইলেন না। তিনি যে-নৈতিক স্বতঃসিদ্ধের কথা মুখে বলা হয় তা সদর্থে গ্রহণ করলেন, এমনকী সন্ত্রাসবাদের মার্কিন সংজ্ঞাও সঠিক বলে ধরে নিলেন। কিন্তু তা হলে, বলতেই হবে যে মহাবিশ্বে তার ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। তবু আর-একটু এগোনো যাক। এ পর্যন্ত এলেই সন্ত্রাসবাদের স্পষ্ট কিছু নমুনা তার পাওয়ার কথা। ১১ সেপ্টেম্বরই যেমন সন্ত্রাসবাদী নৃশংসতার এক ভয়াবহ উদাহরণ। একই রকম স্পষ্ট আর-একটা উদাহরণ হল যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেনের সরকারি প্রতিক্রিয়া। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল সার মাইকেল বয়েস যা ঘোষণা করেছিলেন। *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর প্রথম পৃষ্ঠায় তা বেরিয়েছিল অক্টোবরের শেষে (২৮। ১০। ০১)। তিনি আফগানিস্তানকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে 'যত দিন তারা নেতৃত্বের পরিবর্তন না-ঘটাচ্ছে,' যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন তাদের বিরুদ্ধে তত দিন আক্রমণ চালিয়ে যাবে।

সরকারি সংজ্ঞানুযায়ী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের এ এক আদর্শ নমুনা। ভেবে দেখুন, একেবারে আদর্শ নমুনা।

এর দু-সপ্তাহ আগেই জর্জ বুশ আফগানদের জানিয়ে দেন যে যত ক্ষণ তারা সন্দেহভাজন অপরাধীদের ধরিয়ে দেবে না, আক্রমণ চলবে। মনে রাখবেন যে বোমাবাজি শুরু হয়ার কয়েক সপ্তাহ পর ভেবেচিন্তেই তালিবানদের

www.pathagar.com

উৎখাত করা হয়। বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থেই সেটা করা হয়, যাতে তাঁরা লিখতে পারেন যে এ যুদ্ধ কত ন্যায্য।

এ-ও আদর্শ সন্ত্রাসবাদ : আমরা তোমাদের বোমা মেরে যাব, যত দিন না তুমি কিছু লোককে ধরিয়ে দাও, যাদের আমরা চাইছি যে তুমি ধরিয়ে দাও। তালিবানরা প্রমাণ চেয়েছিল, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ঘৃণাভরে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। ঐ সময়েই যুক্তরাষ্ট্র এমনকী বহিঃসমর্পণের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে, যার ফলাফল গুরুতর হতে পারত। সে আমরা বলতে পারি না, কারণ তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

মঙ্গলবাসী নিশ্চিত এ সমস্তই নথিভুক্ত করবেন। এবং তিনি যদি সামান্য পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে থাকেন তো আরও উদাহরণ যুক্ত করে তিনি দ্রুত এর কারণ ও খুঁজে বের করতে পারবেন। কারণ সমস্তই খুব সোজা। বিশ্বের শাসকদের তো এ বিষয়টা পরিষ্কার করতেই হবে যে তারা কোন কর্তৃপক্ষের কাছেই নত হন না। ফলে তারা এ কথা ভাবতেই পারেন না যে এ জন্য তাদেরও প্রমাণ দিতে হবে। বহিঃ-সমপর্ণের জন্য অনুরোধের প্রস্তাব তারা মানেন না। এ ভাবে তাঁরা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করেন এবং করেন সরাসরি। যুক্তরাষ্ট্র খুব সহজেই পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন কর্তৃত্ব পেতে পারত। তার খুব কিছু কারণ নেই, কিন্তু তারা তা পেতেই পারত। কিন্তু প্রাপ্তির সে পথ তারা প্রত্যাখ্যান করে।

সে তারা ঠিকই করে। আন্তর্জাতিক বিষয়-আশয় ও কূটনীতির আলোচনায় এর একটা পরিভাষাও আছে। এ হল বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি। এ আর-একটা পারিভাষিক বয়ান হল এ কথা ঘোষণা করা যে, আমরা সন্ত্রাসবাদী একটা রাষ্ট্র এবং তোমরা যদি আমাদের পথে বাধা দাও, তা হলে তার ফলাফলের দায় তোমার। এখন সেটা অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের আইনি সূত্র বা অন্যত্র যে-ভাবে তা সংজ্ঞাত, সেই সরকারি অর্থে যদি 'সন্ত্রাসবাদ'কে আমরা ব্যবহার করি, তা হলেই সত্যি। কেন তা গ্রহণীয় নয়, তা আগে বলেছি।

www.pathagar.com

নৈতিক স্বতঃসিদ্ধতার কথায় ফিরে যাই। সর্বত্র স্বীকৃত এবং ন্যায্য ও প্রশংসনীয় বলে বর্ণিত সরকারি মতে, যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সন্দেহ-ভাজনদের সমর্পণ না-করা পর্যন্ত, বা বয়েস-এর পরের শর্ত মেনে বলা যায় যে নেতৃত্বের বদল না-করা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র আফগানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ পরিচালনা করার অধিকারী। এর জন্য তারা কোন প্রমাণ দেয়নি বা বহিঃসমর্পণের অনুরোধ করেনি। তা বেশ। এর থেকে সুসমাচারের বয়ান অনুযায়ী ভণ্ড না-হলে যে- কেউ এই সিদ্ধান্তে আসবে যে, হাইতিও তা হলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বড়-সড় একটা সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে, যত দিন না তারা এমানুয়েল কনস্ট্যান্ট-কে তাদের হাতে সমর্পণ করছে। লোকটা এক সন্ত্রাসবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে অন্তত চার-পাঁচ হাজার লোককে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত।

এ ক্ষেত্রে প্রমাণ নিয়ে কোন সংশয় নেই। তাকে বহিঃসমর্পণের জন্যেও তারা বার-বার অনুরোধ করেছে। সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের ধরিয়ে না-দিলে তারাও ঘোর সন্ত্রাসের শিকার হবে, আফগানিস্তান নিয়ে এ আলোচনার মধ্যেই, সম্প্রতি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১-এও তারা এই অনুরোধ করেছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মরেছে মাত্র চার-পাঁচ হাজার কালো মানুষ। এর বোধ হয় তেমন কোন গুরুত্ব নেই।

তা হলে তাদেরও যুক্তরাষ্ট্রে বড় আকারে সন্ত্রাস ছড়ানো উচিত ছিল। তারা বোমা মারতে পারবে না, বা ধরুন জৈব-সন্ত্রাস বা ঐ জাতীয় কিছু তারা পারবে না, তা হলে যুক্তরাষ্ট্র যত দিন না তার নেতৃত্ব বদল করে, তত দিন তারা সন্ত্রাস ছড়ানোর অন্য কোন পথ নিতে পারে। পুরো বিশ শতক জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু হাইতিতে ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী অপরাধ ঘটিয়ে এসেছে।

নৈতিক স্বতঃসিদ্ধের নিয়ম মেনে নিকারাগুয়াও ঐ একই কাজ করতে পারে। ঘটনাচক্রে তার চাঁদমারি হবে সেই সমস্ত লোক, যারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই পুনর্ঘোষিত যুদ্ধের নেতৃত্বে আছেন। ১১ সেপ্টেম্বরের চেয়ে নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ অনেক ভয়ানক ছিল।

www.pathagar.com

মনে করে দেখুন, লক্ষ-লক্ষ লোক সেখানে খুন হয়েছিল, দেশটা পুরো বিধ্বস্ত, যার থেকে নিকারাগুয়া হয়তো আর কোন দিনই সে ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

এ-ও এক অবিতর্কিত উদাহরণ। এ নিয়ে তর্কের কিছু নেই। অবিতর্কিত, কারণ বিশ্ব-আদালতই তখন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা করেছিল। নিরাপত্তা পরিষদও একই সময়ে সমস্ত রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিকআইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছিল। কারও নাম না-থাকলেও সকলেই জানত সেখানে কাদের কথা বলা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছিল আর ব্রিটেন কোন পক্ষেই ভোট দেয়নি। সাধারণ পরিষদের উপর্যুপরি প্রস্তাবেও একই বিষয়ের পুনারাবৃত্তি, আর যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাঁবেদার দু-একটা দেশের সেই বিরোধিতা। বিশ্ব-আদালত যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী অপরাধ বন্ধ করার ও বিরাট পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তার প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ এক দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আক্রমণ তীব্রতর করে। গণমাধ্যমের তাতে কী প্রতিক্রিয়া হয়, তা আমি আগেই বলেছি। যত দিন না ঐ মারণরোগ নির্মূল হয়, তত দিন এ সব চলে এবং তা এখনও চলছে।

২০০১-এর নভেম্বর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপর্বের মধ্যেই নিকারাগুয়ায় একটা নির্বাচন হয় আর যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক ভাবে তাতে মাথা গলায়। এই নির্বাচনে অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ফল যে যুক্তরাষ্ট্র মেনে নেবে না, সে ব্যাপারে নিকারাগুয়াকে তারা সতর্ক করে দেয়। এমনকী তার কারণও জানিয়ে দেয়। স্বরাষ্ট্র দপ্তর ব্যাখ্যা করে বলে যে, ১৯৮০-র দশকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদে নিকারাগুয়ার ভূমিকা তারা ভুলে যায়নি। সে সময়ে নিকারাগুয়া আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ প্রতিরোধ করলে সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের জন্য নিন্দা করে।

এখানে এ সমস্তই সন্ত্রাসবাদ আর ভণ্ডামির প্রতি অতি-আবেগে সমর্পিত এক বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে বিনা বাধায় পেরিয়ে যায়, কিন্তু আমার ধারণা, মঙ্গলগ্রহের কাগজে এর কিছু-কিছু শীর্ষ সংবাদের মর্যাদা পাবে। এ সবই এখানে কী ভাবে বিবেচিত হয়, তা আপনি একবার কাগজে চোখ

www.pathagar.com

বোলালেই বুঝতে পারবেন। প্রসঙ্গত, আপনার প্রিয় 'ন্যায় যুদ্ধে'র তত্ত্বটাও এই অবিতর্কিত ক্ষেত্রে আপনি একবার প্রয়োগ করে দেখতে পারেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠের বশ্যতা অর্জন

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ছলে যুক্তরাষ্ট্র-পরিচালিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিকারাগুয়ার তরফেও অবশ্যই প্রতিরক্ষার কিছু ব্যবস্থা ছিল। যেমন তার একটা সেনাবাহিনী ছিল। মধ্য আমেরিকার অন্যান্য দেশে সন্ত্রাসবাদী শক্তি হিশেবে সেনাবাহিনীকেই যুক্তরাষ্ট্র আর তার দালালরা প্রশিক্ষণ দিয়ে অস্ত্র যুগিয়েছিল। ফলে, আশ্চর্যের কিছু নেই যে সেখানে সন্ত্রাসবাদী নৃশংসতার রূপও ছিল ভয়াবহ। এই হল মধ্য আমেরিকার ধরন, যেখানে কপোতরা এ কথা বলতে বাধ্য যে, তা হলে আমাদের সেই মারণরোগই ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এর বলি হয়নি। ফলে, তারা বিশ্ব-আদালত বা নিরাপত্তা পরিষদে বিচারের আবেদন জানাতে যায়নি। অবশ্য তা-ও প্রত্যাখ্যাত এবং ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হত। মঙ্গলগ্রহে তা না-ও হতে পারে।

এই সন্ত্রাসের ফল হল সুদূরপ্রসারী। এখানে, এই যুক্তরাষ্ট্রে, ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী নৃশংসতার সুদূরপ্রসারী ফল নিয়ে উদ্বেগের শেষ নেই, হয়তো তা ঠিকই। যেমন *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর প্রথম পৃষ্ঠাতে আজই (২২ জানুয়ারি, ২০০২) একটা লেখা আছে তাদের সম্পর্কে, যারা এই দুর্ঘটনার দরুন প্রাপ্য ক্ষতিপূরণেরও আওতার বাইরে। এর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট ও ব্যাপক নৃশংসতার শিকার যারা, তাদের সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়, কিন্তু সে কথা মঙ্গলগ্রহ ছাড়া আর কোথায়ই বা ছাপা হবে!

যেমন ধরুন, ক-বছর আগে সালভাদর-এর জেসুইট পাদ্রিদের একটা সম্মেলনের খবর কোথাও ছাপা হয়েছে কি না, খুঁজে দেখতে পারেন আপনি। যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনায় আন্তর্জাতিক এই সন্ত্রাসের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে জেসুইট এই পাদ্রিদের ক্ষেত্রে তো ভয়াবহ। সম্মেলনের প্রতিবেদনে, যাকে তারা সন্ত্রাসের সংস্কৃতি রূপে আখ্যাত করেছেন, তার অবশিষ্ট প্রভাবের ওপর

www.pathagar.com

জোর দেওয়া হয়েছিল, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের আকাঙ্ক্ষাকে বশে আনে। এই প্রভাবের বশে তারা বোঝেন যে, হয় তাদের সন্ত্রাসবাদী শাসক-রাষ্ট্র এবং তার স্থানীয় দালালদের আদেশ মেনে চলতে হবে, নতুবা তাদের ফের সেই মধ্য আমেরিকার বিশিষ্ট ধরনে ফেরত পাঠানো হবে, ১৯৮০-র দশকে রাষ্ট্র-সমর্থিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের চূড়ান্ত পর্বে কপোতপন্থীরা যার সুপারিশ করেছিল। এ সবের কিছুই এখানে প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু আমার ধারণা, মঙ্গলগ্রহে এ সবই সম্ভবত শিরোনাম হবে।

উৎসাহী অংশীদারের দল

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় দফা যুদ্ধের মধ্যে মঙ্গলগ্রহের ঐ সাংবাদিক হয়তো আরও কিছু সাদৃশ্য দেখতে পাবেন। ২০০১-এ যতগুলো সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের কথা আপনি ভাবতে পারেন, তার প্রায় প্রত্যেকে সাগ্রহে সন্ত্রাসবাদবিরোধী ঐ মোর্চায় যোগ দিয়েছিল এবং তার কারণও কিছু গোপন নয়।

সকলেই জানে যে রুশরা কেন এত উৎসাহী, তারা চেচনিয়াতে তাদের ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন চায়।

তুরস্কও খুব আগ্রহী। তারাই প্রথম সেনা পাঠানোর প্রস্তাব দেয়, আর প্রধানমন্ত্রী তার কারণও ব্যাখ্যা করেন। এ হল স্রেফ কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। যুক্তরাষ্ট্র সে দেশকে কম অস্ত্র তো আর যোগায়নি। ক্লিন্টন-আমলে তাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রায় আশি শতাংশই যুগিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যাতে নয়ের দশকে তারা স্বচ্ছন্দে সেই সব নিকৃষ্ট সন্ত্রাসবাদী কাজ ও জাতি নির্মূলীকরণের অভিযান চালাতে পারে। তারা এ জন্য খুব কৃতজ্ঞ, আর তাই তারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই নতুন যুদ্ধে সেনা পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, মনে রাখবেন যে এর কোনটাই কিন্তু সন্ত্রাসবাদ বলে গণ্য হয়নি, কারণ প্রচলিত প্রথানুযায়ী যেহেতু এ সব আমরা করছি, তাই তা সন্ত্রাসবাদ নয়। এ তালিকা অনেক দীর্ঘ, আমি আর বাদবাকির আলোচনায় যাচ্ছি না।

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এ সবই একই রকম সত্য। তাই অ্যাডমিরাল বয়েস-এর যে-ঘোষণার কথা আমি আগে বলেছি, তার সঙ্গে বিখ্যাত ইজরেলি রাষ্ট্রনেতা আব্বা এবান-এর কথার কোন অমিল নেই। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরেই সে কথা বলা হয়। লেবাননে ইজরেলি নৃশংসতার ন্যায্যতার পক্ষেই বলছিলেন এবান, যা তিনি যথেষ্ট ভয়াবহ বলে স্বীকার করলেও যুক্তিসঙ্গত বলে রায় দিয়েছিলেন, কারণ 'সেখানে এমন একটা যৌক্তিক সম্ভাবনা ছিল যে ভুক্তভোগী লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা বন্ধের জন্য এর পর চাপ সৃষ্টি করবে।' লক্ষ করুন, সরকারি অর্থে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের এ-ও আদর্শ নমুনা।

যে-শত্রুতার কথা তিনি বলছিলেন, তখন তা ইজরেল-লেবানন সীমানায় ঘটছে। প্রবল ভাবেই তার উৎস ছিল ইজরেলি, আর প্রায়শ অজুহাতহীন সে সবে মদত যুগিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে, প্রথানুযায়ী তা সন্ত্রাসবাদ নয়, এমনকী সে ইতিহাসের অংশও নয়। সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সুস্পষ্ট সমর্থনেই ইজরেল লেবাননে আক্রমণ চালায়, সেখানে বোমা মারে আর নানান নৃশংসতা ঘটায় এক পরিকল্পিত আগ্রাসনের পক্ষে কিছু অজুহাত তৈরির চেষ্টা ছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সে অজুহাত অবশ্য তারা খাড়া করতে পারেনি, তবু আক্রমণ করতেও তারা ছাড়েনি। আটহাজার লোককে তাতে খুন করা হয়। আজও দক্ষিণ লেবানন দখল করে প্রায় কুড়ি বছর ধরে তারা সেখানে নানান নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে। কিন্তু তার কোন নথিপত্র নেই, কারণ যুক্তরাষ্ট্র তার পক্ষে।

মহার্ঘ নৃশংসতা

১৯৮২-র এই আক্রমণের পরে ১৯৮৫-তে তা তুঙ্গে পৌঁছয়। ঐ বছরই ছিল দক্ষিণ লেবাননে ইজরেল আর যুক্তরাষ্ট্রের নৃশংসতার চরম পর্যায়, যাকে সাধারণত লৌহমুষ্টি অভিযান বা আয়রন ফিস্ট অপারেশন বলা হয়। উচ্চ কর্তৃপক্ষ যাদের 'সন্ত্রাসবাদী গ্রামবাসী' বলে অভিহিত করে, এ হল তাদের

www.pathagar.com

ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও বাস্তুচ্যুতির ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী সিমন পেরেজ-এর অধীনে এ সমস্ত অভিযান ছিল সন্ত্রাসবাদের ঐ শীর্ষ-বছর ১৯৮৫ সালের নিকৃষ্টতম আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী অপরাধের জন্য পুরস্কৃত হওয়ার অন্যতম দাবিদার। মনে রাখবেন যে সন্ত্রাসবাদই ছিল সে বছরের মুখ্য সংবাদ। প্রতিযোগী আরও ছিল। তার একটা হল, ঐ '৮৫-তেই, বেইরুটে গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণটা এক মসজিদের বাইরে এমন সময়ে ঘটানো হয় যাতে মৃত্যুর সংখ্যা হয় সর্বোচ্চ। প্রার্থনা শেষ করে লোকে তখন বাইরে আসছিল। *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর ভয়াবহ বিবরণ অনুযায়ী, ঐ ঘটনায় আশি জন মারা যায় এবং প্রায় আড়াইশো লোক আহত হয়। তার বেশির ভাগ নারী আর কিশোরী। বোমাটা খুব শক্তিশালী ছিল, আশেপাশে বহু শিশু তার প্রচণ্ড শব্দে বিছানাতেই মারা যায়, এবং আরও নানান নৃশংসতা ঘটে। এ সব আদৌ গণনায় আসবে না, কারণ এর পেছনে ছিল সিয়া আর ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স। ফলে, এ সব সন্ত্রাসবাদ নয়। আর বস্তুত পুরস্কারের দাবিদারও নয়।

সন্ত্রাসের শীর্ষ-বছর ১৯৮৫ সালের একমাত্র সম্ভাব্য প্রতিযোগী হতে পারে টিউনিস-এর ওপর ইজরেলের বোমাবাজি, এ বার তার কথা। পঁচাত্তর জন তাতে মারা যায়। ইজরেলি কাগজে তার ভয়াবহ বিবরণ দেন কিছু ইজরেলি সাংবাদিক। বোমারু বিমানগুলো ক্রমে ধেয়ে আসছে—এ খবর তার টিউনিসীয় বন্ধুদের না-জানিয়ে এই নৃশংসতায় যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করেছিল। স্বরাষ্ট্র সচিব জর্জ শুলৎস ইজরেলি প্রধানমন্ত্রী ইৎসাক শামির-এর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করে তাঁকে জানান যে এ কাজের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। ঠিক এ কথাটাই তিনি বলেছিলেন। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রকাশ্য সমর্থন থেকে তিনি সরে যান, যখন নিরাপত্তা পরিষদ তাকে সশস্ত্র আগ্রাসন বলে নিন্দা করে। যুক্তরাষ্ট্র যথারীতি এ প্রস্তাবে কোন পক্ষ নেয় না।

নিকারাগুয়ার মতোই ওয়াশিংটন আর তার দালালদের ভূমিকা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত নয় বলে না-হয় এ ক্ষেত্রেও ছাড় দেওয়া হোক, ধরে নেওয়া হোক যে এ-ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসেরই ঘটনা, আগ্রাসনের মতো তেমন কোন গুরুতর অপরাধ নয়, সে নিরাপত্তা পরিষদ যা-ই বলুক না কেন। এ যদি আগ্রাসন হয়,

www.pathagar.com

তবে নৈতিক স্বতঃসিদ্ধের রীতি মেনে আমরা ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল-এর প্রশ্নে চলে যাব।

সন্ত্রাসবাদের শীর্ষ বছর ১৯৮৫-তে এই হল তিনটে ঘটনা, যা ঐ শীর্ষস্তরের কাছাকাছি যায়। টিউনিসে বোমাবাজির কয়েক সপ্তাহ পরেই প্রধানমন্ত্রী পেরেজ ওয়াশিংটনে আসেন, এবং রেগন-এর সঙ্গে একযোগ মধ্যে প্রাচ্যে 'সন্ত্রাসবাদের অভিশাপ'কে নিন্দা করেন। এর কোন কিছু নিয়েই কেউ কোন মন্তব্য করেনি, আর সেটাই ঠিক, কারণ প্রথাগত অর্থে এর কোন কিছুই সন্ত্রাসবাদ নয়। মনে রাখুন: আমাদের বিরুদ্ধে ওরা কিছু করলে তবেই সেটা সন্ত্রাসবাদ। ওদের বিরুদ্ধে ওদের চেয়ে ঢের খারাপ কিছু আমরা করলে সেটা সন্ত্রাসবাদ নয়। এ সেই বিশ্বজনীন নীতি। মঙ্গলবাসী এটা নিশ্চয়ই লক্ষ করবেন, যদিও এ নিয়ে এখানে কোন আলোচনা করা যাবে না।

এ নিয়ে ক-বছর আগে যখন লিখেছিলাম, তার যা সমালোচনা বেরিয়েছিল, সেটাই বোধ হয় আমার জীবনে সেরা। *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮) তাদের মধ্য প্রাচ্যের প্রতিনিধি মাত্র দুটো কথায় তা সেরে দিয়েছিল—'শ্বাসরোধী বিকার'। আমার তা মোটেই খারাপ লাগেনি। লেখাটা পড়লে দেখবেন, শ্বাসরোধী তেমন কিছু সেখানে নেই, বরং বেশ প্রশান্তিই আছে, কিন্তু বিকার কথাটা একেবারে ঠিক। বলতে চাইছি, একেবারে প্রাথমিক নৈতিক স্বতঃসিদ্ধকে মান্য করে যে-সব ঘটনার বর্ণনা করা উচিত নয়, তা বর্ণনা করতে গেলে বিকারগ্রস্ত আপনাকে হতেই হবে। এ কথা বোধ হয় সত্যি।

ঘৃণ্য অজুহাত

মঙ্গলবাসীর কথায় ফিরে যাই। মধ্য প্রাচ্যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রেক্ষিতে এ যুগে বর্বরতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য সভ্যতার অধঃপাতী বিরোধীর শীর্ষ-বছর হিশেবে কেন যে ১৯৮৫ সালটাকেই বেছে নিল, এ প্রশ্নে সে বিভ্রান্ত হতে পারে। বিভ্রান্ত হতে পারে, কারণ এ পর্যন্ত এ অঞ্চলে আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদের নিকৃষ্ট সব ঘটনা, মধ্য আমেরিকার ঘটনাগুলোর মতোই স্মৃতির গহ্বরে ঢুকে গেছে। এ ছাড়া আরও অনেক ঘটনা আছে, আছে কিছু সাম্প্রতিক ঘটনাও।

যদিও ১৯৮৫ সালের কিছু ঘটনা মনে আছে— ভালো ভাবেই মনে আছে আর সেটাই সঙ্গত, কারণ সে সবই সন্ত্রাসবাদ। ঐ বছর অ্যাকিল ল্যারো-কে ছিনতাইয়ের ঘটনা ও লিয়ন ক্লিংহোফার নামে এক বিকলাঙ্গ আমেরিকানের হত্যাকাণ্ডই সন্ত্রাসবাদের জন্য সরকারি পুরস্কারের দাবিদার। সে কথা প্রত্যেকে জানে। ঠিক জানে, ঘটনাটা সত্যিই খুব নৃশংস। হত্যাকারীরা একে এক সপ্তাহ আগে টিউনিসে বোমাবাজির প্রত্যাঘাত বলে জানায়, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের দিক থেকে যা ছিল অনেক ব্যাপক ও অনেক ভয়াবহ। কিন্তু আমরা যথার্থ ঘৃণার সঙ্গে সঠিক ভাবেই সে অজুহাত বাতিল করে দিই।

আর যারা নিজেদের কাপুরুষ এবং ভণ্ড বলে মনে করেন না, অন্যান্য যাবতীয় হিংস্র প্রত্যাঘাতের ঘটনার মতো এ ক্ষেত্রেও তারা একই নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করেন, যার ভেতর আফগানিস্তানের যুদ্ধও আছে। মনে রাখবেন, তা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন এই প্রত্যাশায় শুরু করা হয়েছিল যে এর ফলে অন্তত কয়েক মিলিয়ন লোক অনাহারের প্রান্তসীমায় গিয়ে পৌঁছতে পারে। আমি আগেই বলেছি যে এ সব আমরা কখনও জানব না। নীতিগত কারণেই জানব না।

কিংবা ছোটখাটো সব নৃশংসতা, ইজরেলের দখল-করা এলাকায় প্রত্যাঘাতের যে-সব ঘটনা এখনই ঘটছে, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থনেই ঘটছে, বরাবরের মতোই সে সব আদৌ সন্ত্রাসবাদ নয়। মঙ্গলবাসী নিশ্চয়ই প্রথম পৃষ্ঠায় এ খবর ছাপবে যে যুক্তরাষ্ট্র এই মুহূর্তে আবার তার দালাল সব রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে, আর সম্ভবত সন্ত্রাসবাদের ব্যাপকতা বাড়াতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেই পুরনো অজুহাতকে খাড়া করছে।

এর সর্বশেষ অধ্যায় শুরু হয়েছিল ২০০০ সালের ১ অক্টোবর। বর্তমান ইন্তিফাদা শুরু হওয়ার প্রথম দিনের পর থেকেই ইজরেলি হেলিকপ্টার নিরস্ত্র পালেস্তিনিদের মিসাইল দিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে। বহু লোককে হত্যা করে, আহত করে। আত্মরক্ষার কোন অজুহাতই সেখানে ছিল না। ('ইজরেলি

www.pathagar.com

হেলিকপ্টার কথাটা শুনলে ইজরেলি পাইলট-চালিত যুক্তরাষ্ট্রের হেলিকপ্টার বুঝতে হবে, কী ভাবে তা ব্যবহৃত হবে, সে কথা সম্যক্ জেনেই যা দেওয়া হয়)।

ক্লিন্টন এই নৃশংসতায় দ্রুত সাড়া দেন। ৩ অক্টোবর ২০০০—ঠিক দু-দিন বাদে ইজরেল-এ তিনি এক সঙ্গে যত মিলিটারি হেলিকপ্টার পাঠানোর ব্যবস্থা করেন— এ দশকে তার চেয়ে বেশি আর কখনও পাঠানো হয়নি। সেই সঙ্গে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পাঠানো অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টারের যন্ত্রাংশও দেওয়া হয়। এ সব কথা প্রকাশ করতে অস্বীকার করে সংবাদমাধ্যম এ কাজে মদত দেয়। ব্যর্থ নয়, খেয়াল করুন, অস্বীকার করে। তারা এর পুরোটা জানত।

গত মাসে মঙ্গলগ্রহের কাগজপত্রে সন্ত্রাস চক্রের বাড়বাড়ন্তকে আরও সাহায্য করতে সেখানে ওয়াশিংটনের হস্তক্ষেপ নিশ্চয়ই শীর্ষ সংবাদ হত। ১৪ ডিসেম্বর মিশেল প্রস্তাব কার্যকর করতে এবং হিংসা নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া তদারক করতে আন্তর্জাতিক পরিদর্শক পাঠানোর জন্য নিরাপত্তা পরিষদের এক প্রস্তাবের যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেয়। তখনই তা সাধারণ পরিষদে যায়, যুক্তরাষ্ট্র আর ইজরেল তার বিরোধতা করে, এবং তা অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ঘটনার কতটা কী প্রকাশিত হয়েছিল, কাগজপত্র ঘেঁটে তা দেখে নিতে পারেন।

এর এক হপ্তা আগে জেনিভায় চতুর্থ জেনিভা সম্মেলনে চুক্তিবদ্ধ শক্তিশালী দেশগুলোর একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যারা এই পবিত্র চুক্তির প্রয়োগে দায়বদ্ধ। এই সম্মেলন, আপনারা জানেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসিদের নৃশংসতাকে অপরাধ রূপে সাব্যস্ত করার জন্য গঠিত হয়। এই সম্মেলন দখলি এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রে আর ইজরেল যা-যা করে, তার প্রায় প্রত্যেকটার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে ও পরিপূর্ণ সমর্থনে যে-সব বসতি স্থাপিত ও বিস্তৃত হয়েছিল, তার স-ব আছে। ক্যাম্প ডেভিডে ক্লিন্টন আর বারাক-এর আলোচনার সময়ে তা আরও বাড়ে। একা ইজরেল এই ভাষ্য প্রত্যাখ্যান করে।

২০০০-এর অক্টোবরে বিষয়টা যখন নিরাপত্তা পরিষদে আসে, যুক্তরাষ্ট্র সে আলোচনায় বিরত থাকে, হয়তো আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতিসমূহ

www.pathagar.com

লঙ্ঘনের মতো ভোঁতা ব্যাপারে, বিশেষত প্রদত্ত পরিস্থিতিতে তাঁদের কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে তারা থাকতে চায়নি। এর ফলে, নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাবের পক্ষে ১৪-০ ভোটের জোরে ইজরেলকে সম্মেলনের আদর্শ উর্ধ্বে তুলে ধরার প্রত্যাদেশ দেয়, যা তারা ফের বেপরোয়ার মতো অগ্রাহ্য করে। ক্লিন্টন-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু সম্মেলনকে 'বেপরোয়া ভাবে অগ্রাহ্য' করার দায়ে ইজরেলের বিরুদ্ধে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একত্রে ভোট দিয়েছিল। কার্যকর ভাবে আন্তর্জাতিক আইন আর ইজরেল-পালেস্তাইনের বিবাদে রাষ্ট্র-সংঘের আগের সিদ্ধান্ত রদ করার ক্লিন্টনীয় বদভ্যাসের সঙ্গে অবশ্য এখনকার কাজটা সঙ্গতিপূর্ণ।

গণমাধ্যম আমাদের জানিয়েছে যে, আরবরা বিশ্বাস করে এই সম্মেলনের নীতিনিয়ম শাসনাধীন সব এলাকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কথাটা মিথ্যে নয়। যদিও একটা জিনিশ সেখানে বাদই থেকে যায়, তা হল আরব-সহ অন্যান্যদের কথা। ২০০১-এর ৫ ডিসেম্বর এক সভায়, যেখানে ইয়োরোপীয় ইউনিয়নের সমস্ত দেশ উপস্থিত ছিল, শাসনাধীন এলাকায় বেআইনি বসতের ক্ষেত্রে সম্মেলনের নীতির প্রয়োগযোগ্যতা আবার স্বীকৃত হয়, এবং তা ইজরেলকে, যার অর্থ যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরেলকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার ডাক দেয়। যুক্তরাষ্ট্র সে সভা বয়কট করে, মানে তা ভণ্ডুল হয়ে যায়। আবারও আপনি এ নিয়ে কতটুকু কী বেরিয়েছে, তা দেখে নিতে পারেন।

এ সবই সেখানে সন্ত্রাসবাদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, যার মধ্যে তার সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকাও আছে। গণমাধ্যম যথারীতি তাতে তার স্বকীয় অবদান রাখে।

সন্ত্রাসবাদের প্রতিক্রিয়া

ধরুন, শেষ পর্যন্ত আমরা মঙ্গলের ঐ পরিদর্শকের পথ ধরে প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করলাম। পরিবর্তে নৈতিক স্বতঃসিদ্ধের তত্ত্বই মেনে নিলাম। যদি আমরা সেই স্তরে নিজেদের উন্নীত করতে পারি, তা হলে, শুধু তা হলেই

www.pathagar.com

সততার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী অপরাধের বিরুদ্ধে যথার্থ প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি।

একটা উত্তর হল, আইনানুগত দেশগুলোর পূর্ব-নজির অনুসরণ করা। যেমন নিকারাগুয়ার নজির। অবশ্যই তা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ তারা বাস্তবের এই তত্ত্ব না-বুঝে এগিয়েছিল যে এ বিশ্ব শাসিত হয় ক্ষমতার জোরে, আইনের প্রয়োগে নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা ব্যর্থ হবে না। সে কথা অবশ্য এখানে আসে না। গত কয়েক মাসের ব্যাপক প্রচারের মধ্যে এ বিষয়ে একটা কথাও আমি দেখিনি।

আর-একটা উত্তর দিয়েছেন বুশ আর বয়েস। কিন্তু সে উত্তরও সরাসরি বাতিল করা যায়, কারণ এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না যে, হাইতি বা নিকারগুয়া বা কিউবা বা আর কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্র বা তার দালাল সব রাষ্ট্র বা অন্যান্য ধনী ও ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোন সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ পরিচালনা করার অধিকার আছে।

ঢের যুক্তিসঙ্গত উত্তর বরং এসেছিল ভ্যাটিকান-সহ অন্য কিছু সূত্র থেকে। গত অক্টোবরে সর্বাগ্রগণ্য অ্যাংলো-আমেরিকান সামরিক ঐতিহাসিক মাইকেল হাওয়ার্ড তা প্রথম উচ্চারণ করেন। বস্তুত অগ্রণী প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকা *ফরেন অ্যাফেয়ার্স*-এর (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০২) চলতি সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। হাওয়ার্ড-এর যোগ্যতা বা মর্যাদা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুণে মুগ্ধ তিনি, এমনকী বিশ্বায়িত শাসনে তার উত্তরাধিকারীদের নিয়েও তিনি উচ্ছ্বসিত। সুতরাং তাঁকে নৈতিক আপেক্ষিকতা বা এ জাতীয় কোন অপরাধে অভিযুক্ত করা যাবে না।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার উল্লেখ করে তিনি এ জাতীয় অপরাধমূলক চক্রান্তের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযানের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ হল, এ রকম সব চক্রের সদস্যদের খুঁজে বার করে তাদের এক আন্তর্জাতিক আদালতে পেশ করা উচিত, যেখানে তারা ন্যায্য বিচার পাবে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে উপযুক্ত শাস্তি পাবে। অবশ্যই এ পরামর্শকে কাজে পরিণত করা হয়নি, কিন্তু সেটাও আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়েছে। এ যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তা হলে এর চেয়েও নিকৃষ্ট সব সন্ত্রাসবাদী অপরাধের ক্ষেত্রেও

www.pathagar.com

তা প্রয়োগ করা উচিত। যেমন ধরুন, নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ, তার চেয়েও নিকৃষ্ট যা এখনও এখানে-ওখানে ঘটেই চলেছে। এ সব অবশ্য কখনওই কার্যকর হবে না, তবে তার কারণ একেবারেই আলাদা।

তো, দেখা যাচ্ছে, সততা আমাদের বড় দ্বন্দ্বে ফেলেছে। নিস্তার পাওয়ার সোজা পথ হল প্রচলিত ভণ্ডামি। আর-একটা উপায় হল, যা আমাদের গ্রহান্তরের বন্ধু গ্রহণ করেছেন। তিনি আসলে সেই সব নীতি মেনে চলেন, যা আমরা আপন শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বজা উড়িয়ে খুব প্রচার করি, কিন্তু মানি না। এই বিকল্পটা অবশ্য পছন্দ হওয়া একটু কঠিন, কিন্তু এ দুনিয়াকে আরও ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তা ভীষণ জরুরি।

[*জার্নালিস্ট ফ্রম মার্স : হাউ দ্য ওয়র অন টেরর' গুড বি রিপোর্টেড*-এর অনুবাদ। সংবাদ প্রতিবেদনে যাথার্থ্য ও সঠিকতার পঞ্চদশ বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণের সম্পাদিত ভাষ্য, নিউ ইয়র্ক, ২২ জানুয়ারি, ২০০২] *এক্সট্রা!* দ্য ম্যাগাজিন অফ ফেয়ারনেস অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি ইন রিপোর্টিং (FAIR)] এর জুলাই-আগস্ট ২০০২ সংখ্যায় প্রকাশিত]

www.pathagar.com

বাঙলায়ন প্রকাশিত অন্যান্য বই

চিনোয়া আচেবে। থিংস ফল এপার্ট
আলব্যের কামু। দ্য মিথ অব সিসিফাস
নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি। দ্য প্রিন্স
মাও জেদং। রেড বুক
বব ডিলান। গিটার আর একটা অন্ধকার রাস্তা
জন লেনন। গান ছাড়া জানি না কিছুই
ফেদেরিকো ফেলিনি। একটি ছবির জন্ম ও অন্যান্য
আলেক্সজান্দ্রা গ্রুমিং। মিকেলেঞ্জেলো
অরুন্ধতী রায়। দুই বিশ্ব
জাঁ পল সার্ত্র। জেনোসাইড
কার্ল মার্ক্স। ইকনমিক এন্ড ফিলোজফিক্যাল ম্যানুস্ক্রিট:১৮৪৪
কার্ল মার্ক্স। জার্মান ভাবাদর্শ
কার্ল মার্ক্স। ডক্টরাল থিসিস
ব্রেইজ পাসকেল। পজে
লাওৎস। তাও তে চিং। লাওৎস কথিত জীবনবাদ
কহলীল জীবরান। নবীর বাগান
আলিয়া আলী ইজেতভেগোভিচ। প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও ইসলাম
ক্লদ লেভিস্ত্রস। মিথ এন্ড মিনিং
ফরহাদ মজহার। মোকাবিলা
এবাদুর রহমান। দাস ক্যাপিটাল
শাহাদুজ্জামান। বায়োস্কোপ, সিনেমা ও প্রভৃতি
খালিদ সাইফ। জালালুদ্দিন রুমির প্রেমের কবিতা
শফিক মনজু। বয়াংসিগীতি

www.pathagar.com

নোয়াম চমস্কি

গণমাধ্যমের চরিত্র

a BANGLAYAN publication

প্রচ্ছদ আজহার বিন ফরহাদ